দুঃসময়

দুঃসময়

অন্যধারা
কলকাতা

স্বত্ব : চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ / মে ১৯৬৩

প্রকাশক :
অন্যধারার পক্ষে
গীতা দত্ত
১২৯/৫৩ এস, এন, রায় রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩৮

মুদ্রাকর :
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

দুঃসময়

ব্যাপারটা ঘটল অথবা ঘটে গেল আচম্বিতে।

বড় রাস্তা থেকে অতিদ্রুত একটা ছোট রাস্তায় ঢোকার মুখে তার মনে হয়েছিল অন্ধকারে দাঁড়ানো জিপ গাড়িটা স্টার্ট দিল। মানুষ তার স্বভাবে সতর্কতা আনতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের নিজস্ব স্বভাবে সতর্কতা আনা যায় না। গাড়িটা যদি স্টার্ট নেবার আগে বিন্দুমাত্র শব্দ না করতো তাহলে সুখেনের পক্ষে বোঝা কঠিন হতো যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। জিপ গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের অন্ধকার ছায়ায়। গাছটার ওপাশেই ফুটপাতের ওপর সিগারেট আর পানের গুমটি দোকান। এইসব দোকানে সারাক্ষণ একটা ক্লান্তিহীন রেডিও বাজে। একটু আগেও বাজছিল। সুখেন ঠিক মনে করতে পারল না, শুধু ক্ষীণভাবে সে ধারণা করল, সম্ভবত ওই রেডিওর শব্দেই সে এক মুহূর্তের জন্য ওই দোকানটাব দিকে তাকিয়েছিল আর ঠিক তখনই আবছাভাবে গাছের অন্ধকার ছায়ায় জিপ গাড়িটাকে সে দেখতে পায়। খুবই চকিতে দেখা, কিন্তু জিপ গাড়ির মাথায় ওয়্যারলেসের শিকটা তার নজর এড়ায়নি। নজর এড়িয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা আরেকটা গাড়ির হেডলাইটের আলো ক্ষণিকের জন্যে জিপ গাড়িটাকে আলোকিত না করত।

বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ার কথাটা তখনই তার মাথায় আসে। বরং বলা যায়, প্রায় একইসঙ্গে দুটো ঘটনা দু'ভাবে ঘটে যায়। ওয়্যারলেস লাগানো জিপগাড়িটার দিকে নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সন্ধানী চোখ ছোট রাস্তার দিকে ছুটে যায় এবং চোখের দৃষ্টি আরেকটা পথের সন্ধান পেতেই তার হাঁটার ক্ষিপ্রতা বাড়ে। গলির মুখটা অতিক্রম করবার সময় সে জিপ গাড়িটা স্টার্ট দেবার শব্দ শুনতে পায়। গলিটা অন্ধকার। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার

অথবা বাগবাজারের যে সব রাস্তাকে গলি বলা হয় এটা সেরকম নয়। এই রাস্তা দিয়ে ওই জিপ গাড়িটা অনায়াসেই ছুটে আসতে পারে। রাস্তাটা অন্ধকার ছিল বলে সুখেন একবার পেছন ফিরে দেখে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

রাস্তাটা কোথায় গিয়ে কেমনভাবে শেষ হয়েছে সেটা সুখেনের জানা ছিল না। কিন্তু অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে টের পেল কলকাতার এই অঞ্চলটায় কোন রক নেই. রকে বসা কৌতূহলী জনতা নেই। রাস্তাটাও একেবারে সোজা যায়নি। সে কখনো ডাইনে বেঁকেছে, কখনো বামে। বাম অথবা দক্ষিণ নিয়ে বাছাবাছি অথবা ভাবাভাবির সময় ছিল না সুখেনের। ক্রমাগত ডাইনে আর বামে ঘুরতে ঘুরতে সে দেখল তার রাস্তাটা এসে মিশেছে অপেক্ষাকৃত চওড়া আরেকটা রাস্তায়। আর সেই রাস্তার ওপারেই একটা পার্ক। সুখেন রাস্তা পেরোবার আগে সতর্ক হল। পার্কের গেটের কাছে, ঠিক গেটের মুখটায় একটা লরি বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জনা তিনেক লোক আলো জ্বেলে সেটা সারাবার চেষ্টা করছে। লরিটা কাত্ হয়ে আরোগ্যের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে হুশ-হাশ্ করে ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার চলে যাচ্ছে। সুখেন দু পাশে তাকিয়ে দেখল কোনদিক থেকে কোন জিপ গাড়ি আসছে কিনা। মুহূর্তটা এমনই যে, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার উপায় নেই। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে সুখেন রাস্তা পেরিয়ে এসে পার্কে ঢুকল। তার কাছে রাস্তার চাইতে পার্কটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কেন না, জিপ গাড়ি নিয়ে পার্কে ঢোকা যাবে না। রাস্তায় আলো থাকলেও পার্কে কোন আলো নেই। গোটা পার্ক জুড়ে থই-থই করছে অন্ধকার। সুখেন কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুরির ফলার মতো দৃষ্টিটা চালিয়ে দিয়ে সে দেখে নিতে চাইল এই অন্ধকার তার পক্ষে কতখানি নিরাপদ। পার্কের বাঁদিকে কোন রাস্তা নেই। অন্তত অন্ধকারে নেই বলেই মনে হল সুখেনের। কিন্তু ডানদিকের রাস্তাটা বোঝা যাচ্ছে। আলো জ্বেলে মাঝে মাঝে এক-একটা গাড়ি শব্দ করে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। এই জায়গাটা কোলকাতার কোন্ জায়গা সেটা সুখেন বুঝতে পারল না। এমন কি পার্কের চেহারাটাও অন্ধকারে সে ভালো করে দেখতে পারছে না। কেবল কিছুটা অগোছালো হাওয়া আর গাছের পাতার ভেতর থেকে উঠে আসা অস্পষ্ট মর্মর ধ্বনির মধ্যে সে একটা ফুলের গন্ধ পেল। যেন খুব দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসা কোন নাম না জানা ফুলের গন্ধ। মিহি আর ঠাণ্ডা স্বাদের সেই গন্ধ তাকে বুঝিয়ে দিল এই অন্ধকার পার্কের কোথাও ফুল ফুটেছে।

সুখেন পার্কের মধ্যে দিয়ে কতটুকু পথ এসেছে সেটা বোঝার আগেই তার নজর আটকে গেল ডানদিকের রাস্তায়। যেহেতু ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল

করছে তাই তার নজরটা থেকে-থেকেই ডানদিকে চলে যাচ্ছিল। সে দেখল একটা গাড়ির আলো এসে পার্কের পাশে থেমে গেল। দূরত্ব যথেষ্ট, তবুও সুখেনের বুঝতে অসুবিধা হল না, ওটা জিপ গাড়ি। গাড়ির মাথায় ওয়্যারলেস লাগানো আছে কিনা সেটা এখান থেকে বোঝবার উপায় নেই। সুখেন ক্রমশ বাঁ দিকে সরে যেতে যেতে দেখল পার্কের মধ্যে টর্চের আলো পড়ছে। গাড়ির হেডলাইট দুটো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুখেন যদি পার্কের এতখানি বাঁ দিকে সরে না আসতো তাহলে ডান দিকের রাস্তা থেকে ফেলা টর্চের আলোয় তাকে নির্ঘাৎ দেখা যেত। সুখেন আরও দ্রুত পা চালিয়ে বাঁ দিকের পাঁচিলের কাছে সরে এসে ওই পাঁচিলের সঙ্গেই নিজের শরীরকে মিশিয়ে রাখল। ডানদিকের রাস্তা থেকে পার্কের ভেতরে টর্চের আলো ফেললে সে আলো এতদূরে আসবার কথা নয় যদি না ওরা পার্কের ভেতরে চলে আসে। সুখেন ততক্ষণে বুঝে গেছে পার্কের পাঁচিলের উচ্চতা খুব সামান্য। অনায়াসেই ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া যাবে। পার্কের ওপারে, অর্থাৎ বাঁ দিকে চোখ তুলে তাকাল সুখেন। যতদূর চোখ যায়, যেতে পারে ততদূর জুড়ে স্তব্ধ অন্ধকাব। অন্ধকারে রূপকথার পাষাণ দৈত্যের মতো কয়েকটা বাড়ি। সুখেন অবাক হয়ে দেখল চারপাশের মূর্ছিত অন্ধকারে অহঙ্কারী গাম্ভীর্যে একটিমাত্র বড় বাড়ি আলো জ্বেলে এই পার্কটার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন অন্ধকার সমুদ্রের পাড়ে একটি নিঃসঙ্গ বাতিঘর।

সুখেন ভাবছিল এখনই পাঁচিলটা ডিঙোবে কিনা। পাঁচিলের ওপাশে কী আছে সেটা তার জানা নেই। খানাখন্দ থাকা বিচিত্র নয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখল দেশলাই আছে কিন্তু জ্বালাতে সাহস হল না। গলা শুকিয়ে এসেছিল। বুকের মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনার হাপর টেনে-টেনে গোটা বুক এখন চৈত্রের মাটির মতো ফুটিফাটা হয়ে যাচ্ছে। জল খাবার ইচ্ছেটা জেগেছিল অনেক আগে, এখন তো জল খাবার কোন প্রশ্নই উঠছে না। জিভ দিয়ে আবার ঠোঁট চেটে নিয়ে সুখেন ঢোক গিলে সামনের অন্ধকারে তাকালো। হাওয়ার মধ্যে বিপদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই পার্ক আর বেশিক্ষণ নিরাপদ থাকবে না। টর্চের আলো পার্কের মধ্যে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে। সুখেন একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে নিজেকে মনে মনে তৈরি করে ফেলল। অন্ধকারে কাউকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সুখেনের মনে হল অন্ধকারে এক নয় একাধিক মানুষের ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুখেন আর দেরি করতে পারল না। দু হাতের থাবা পাঁচিলের মাথায় রেখে সে শরীরটাকে শূন্যে তুলে পাঁচিল ডিঙোবার জন্য তৈরি হল। ঠিক তখনই কিংবা তার এক মিনিট আগে যদি সে এই সিদ্ধান্তটা নিত তাহলে হয়তো নিজেকে সে নিরাপদ করতে পারত। অন্তত নিরাপদে আরো খানিকটা পথ সে

পালাতে পারত। কিন্তু তার নিয়তি সে রকম ছিল না।

সে যখন নিজেকে তৈরি করেছে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপাশে যাবার জন্য ঠিক তখনই তার বুকের ওপরে আছড়ে এসে পড়ল আরেকটা শরীর। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে মানুষ যেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে এও তেমনই পড়া। অন্ধকারে তাকে দেখা গেল না, শুধু শরীরের স্পর্শ দিয়ে বোঝা গেল, যে অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে তার ওপর পড়েছে এবং মাটিতে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচবার জন্যে অভ্যাসবশে যে দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরেছে সে কোন পুরুষ নয়। মেয়েটির কত বয়স অথবা সে রাস্তার কোন পাগলী কিনা সে তথ্য জানার উপায় ছিল না। মেয়েটির শরীর তাকে জানিয়ে দিল তার বুকে কোন আবরণ নেই। নিরাবরণ স্তনের স্পর্শ অন্ধকারেও টের পাওয়া যায়। মেয়েটিকে কয়েক মুহূর্ত সময় দিয়েছিল সুখেন। তাবপর নিজের তাগিদেই সে অন্ধকারে মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়ে বুঝেছিল মেয়েটির শরীরেও কাপড় নেই। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত শুধুই বস্ত্রহীন শরীর। সুখেন মেদবহুল সেই নারীর কাঁধে আর পেটে হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়েছিল সামনের দিকে। ধাক্কাটায় যথেষ্ট জোর ছিল। অন্ধকাবে মেয়েটির পড়ে যাওয়ার শব্দ হতেই সুখেন এক লাফে পাঁচিলের মাথায় উঠে এল এবং নিচে লাফিয়ে পড়তে পডতে শুনল আহত এবং ক্রুদ্ধ গলায় চাপা গর্জনে মেয়েটি বলছে, 'খানকীর ছেলে। নিজে পালালি আর আমায় ধাক্কা মেরে গেলি। কাল আসিস তোর বাপের··

সুখেন আর শোনেনি। সে সামনের দিকে দৌড়চ্ছে। চারপাশের অন্ধকারে ওই একটা মাত্র বাড়ি তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। অন্য বাডিগুলো চারদিকে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে। একবার মনে হয়েছিল পেছন ফিরে দেখে নেবে কেউ তাব পিছু নিয়েছে কিনা। কিন্তু সে ইচ্ছাটা তাকে ত্যাগ করতে হল। কারণ পেছন দিকে ঘাড ফেরাবার কথাটা মনে হতেই সে শুনতে পেল পার্কের দিক থেকে পুলিশের বাঁশির আওয়াজ আসছে। বাঁশির এই শব্দটার মানে সে জানে। এটা কোন নিরীহ ব্যাপার নয়। পুলিশ যখন তার বাঞ্ছিত শিকারের দেখা পায় এবং সেই শিকাব যখন তার নাগাল থেকে পালাবার জন্য ছোটাছুটি করে, তখন শিকারী পুলিশ তার সতীর্থদেব সজাগ করে দেবার জন্য এই রকম করেই বাঁশি বাজিয়ে থাকে। এব তীব্র শব্দে কোন সুর নেই কিন্তু গা ছমছম করা একটা ভাষা আছে। সেই ভাষা যেন বলতে চায়, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

সুখেন জানে টর্চের আলো তার গায়ে না পড়লেও পাঁচিল ডিঙোবার সময় মেয়েটা যখন গালাগাল করছিল তখন একটা আলো, সম্ভবত টর্চেব, তার দিকে লক্ষ্য করে ধাঁ বেগে ছুটে এসেছিল। আলোটা তার গায়ে পড়েছে কি পড়েনি

সেই মুহূর্তেই সে লাফ দিয়ে নেমে এসেছে নিচে। একটু আগে নিচে লাফিয়ে পড়লে তার মধ্যে একবিন্দুও সন্দেহ থাকতো না।

পার্কের ভেতর থেকে বাড়িটাকে যত কাছে মনে হয়েছিল আসলে ঠিক ততটা কাছে নয়। বাড়িটার কাছে এসে সে বুঝল, সে এসে গেছে বাড়িটার পেছন দিক দিয়ে। ঘুরে সামনের দিকে যাওয়ার বিপদ থাকতে পারে বিবেচনা করে সে পেছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ঠিক কতখানি ওপরে অথবা কত তলা ওপরে উঠে এসেছে সে ব্যাপারে সুখেনের কোন ধারণা নেই। এবার সিঁড়িটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে তার সামনে বন্ধ দরজা। দরজার বাইরে থেকে বোঝা যায়, ভেতরে বেগম আখতারের রেকর্ড অথবা ক্যাসেট বাজছে। রীতিমতো মজলিশি মেজাজের ঠুংরী। সুখেন বন্ধ দরজার গায়ে কান পাতল। দরজায় ধাক্কা দেবার আগে সে ভেবে নিল, দরজা খোলার পর সে কী বলবে অথবা কী করবে? কিংবা দরজাটা খুলে দেবে কে? নির্ঘাৎ কোন পুরুষ। হয়তো চাকর নয়তো বাড়ির কোন যুবক। এ বাড়িতে কোন অতিথি কখনও এই দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি। অতএব, দরজা খোলার আগে গৃহস্বামী হয়তো সতর্ক হবেন। সুখেন জানে, আসল কথাটা বললে কেউ তাব জন্য দরজা খুলে দাঁড়াবে না। দিনের বেলা অচেনা আগন্তুককে মানুষ যে চোখে দেখে রাত্রিবেলা সেই চোখে দেখে না। 'রাত্রি' শব্দটার গায়ে অনেক নষ্টামী লেগে আছে। রাত্রি মানুষের বিশ্বাস হরণের সময়। ভোরেব আকাশে আর বাতাসে যে পবিত্রতা থাকে রাত্রিতে তার দেখা পাওয়া ভার। রাত্রির সঙ্গে ভোগের, সম্ভোগের যেন খুব নিবিড় সম্পর্ক।

সুখেন অবশ্য ভেবে পায় না, ভোরকে সবাই এত পবিত্র চোখে দেখে কেন? প্রতিদিন ভোরেই তো কলকাতার বাজারে কয়েক হাজার পাঁঠার শিরচ্ছেদ আর রক্তপাত ঘটে, প্রতিটি ভোরেই তো শুরু হয় মানুষকে নতুন করে ঠকাবার নতুন নতুন কায়দার শুভারম্ভ! কসাইখানার দরজা তো ভোরেই খোলা হয়। আসলে, দুঃখের পৃথিবীতে সকাল, রাত্রি, সন্ধ্যা অথবা দুপুর সবই এক চেহারা নিয়ে আসে। সুখেন দরজায় ধাক্কা দেবার আগে মনে মনে নিজেকে তৈরি করল। একটু বেপরোয়া না হলে পৃথিবীতে নিজের জায়গা খুঁজে নেওয়া যায় না। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, একটু আশ্রয়ের জন্য ঠিক কতখানি বেপরোয়া হওয়া দরকার?

প্রশ্নটা সুখেনের বুকের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে লাগল। সে জানে তার হিপ পকেটে একটা ছুরি আছে। একজন মানুষের প্রাণ নেবার পক্ষে এবং প্রাণ নেবার হুমকি দেবার পক্ষে ছুরিটা যথেষ্ট। কিন্তু এই যুগটা ঠিক ছুরি, ভোজালীর

নয়। হাতের মুঠোয় রিভলবার থাকলে ভয় দেখানো অনেক সহজ। নিজের জন্য অন্যকে ভয় দেখানোটা যে কখনও এত জরুরী মনে হবে সে কথা কিছুদিন আগেও এমন করে তার মনে হয়নি। সুখেন দরজায় ধাক্কা দেবার জন্য হাত তুলেও ইতস্তত করছিল। বাড়ির মধ্যে কতজন লোক আছে সেটা তার জানা নেই। যদিও এরকম হালফ্যাশনের বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবার সাধারণত থাকে না। স্বামী, স্ত্রী, একটি কিংবা দুটি বাচ্চা। কিন্তু স্বামীটি কেমন ? হাতে রিভলবার থাকলে এত ভাবতে হতো না। ওই যন্ত্রটার অসীম ক্ষমতা।

সুখেন সিঁড়ির মাথা থেকে নিচের দিকে তাকাল এবং তাকিয়েই তার বুকের রক্ত পাক খেয়ে হিম হয়ে গেল। বাড়িব সামনের দিক থেকে জিপটা এগিয়ে আসছে। হেডলাইটটা একটা দেওয়ালের গায়ে আলো ফেলতে ফেলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। ভয় এবার তাকে বেপরোয়া করে তুলল। সে ডান হাত দিয়ে হিপ-পকেট থেকে ছুরিটা টেনে বার করে বাঁ হাতে জোরে জোবে ধাক্কা দিল দবজার গায়ে। একবার, দু বার, তিনবার। অধৈর্য এবং ক্ষিপ্ত সুখেন যখন চতুর্থবার দবজার গায়ে লাথি মারতে যাচ্ছে তখনই দরজাটা খুলে গেল।

কে দরজা খুলে দিল সেটা দেখবার সময় ছিল না। সে খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের মতো ভেতবে এসে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেই বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে সামনেব দিকে তাকাল। এবং তাকিয়েই কিছুটা অবাক হয়ে গেল। তার সামনে বলশালী কোন পুরুষ নয়, একজন নারী এবং সাধারণভাবে যাদের সুন্দরী বলা হয় এই নাবী ঠিক তাদের দলের। সুখেন জানে না, কখনও ভেবে দেখেনি, নারী, মহিলা অথবা যুবতী এইসব বিভিন্ন শব্দের আলাদা-আলাদা তাৎপর্য আছে কিনা। নারী অথবা মহিলা বললে স্ত্রীজাতীয় কাউকে বোঝায় কিন্তু ওই দুটি শব্দ থেকে তার বযস অনুমান করা যায় না। সেদিক থেকে খুবই সঠিক হবে, সুখেন এখন যাকে দেখছে এবং ভীত ও উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু চোখে খর দৃষ্টি দিয়ে যে সুখেনকে দেখছে তাকে যদি যুবতী বলা হয়। মেয়েটির পরনে গোলাপী রঙের সিন্থেটিকেব শাড়ি যা এখন শিথিল হয়ে শরীর থেকে গাড়িয়ে নেমে যেতে চাইছে। মেয়েটিব দুই চোখে যে অপার বিস্ময় এবং ভয় সেটা এবার ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসার চেহারা নিচ্ছে। কোন মেয়ে মুখেব প্রসাধন করতে করতে হঠাৎ উঠে এলে তার মুখে যে অস্বাভাবিকতা থাকে এই মেয়েটির মুখেও সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। চোখের কোলে কাজলটানা হয়েছে, মুখের চামড়ায় প্রসাধনের টাটকা চিহ্ন অথচ ঠোঁট দুটো বিবর্ণ। মাথায় তখনও হেয়ার ক্লিপ লাগানো এবং হাতে ভ্রূ আঁকার কালো পেন্সিল।

সুখেন মেয়েটির মাথার পাশ দিয়ে ভেতরের দিকে তাকালো। সুখেন এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে ভেতরের ঘরগুলোর অস্তিত্ব বোঝা গেলেও দেখার উপায় নেই। সুখেন দেখল, মেয়েটির ঠোঁট কাঁপছে। সম্ভবত সে এবার কিছু বলবে, হয়তো চিৎকার করে উঠবে। অতিরিক্ত বিস্ময় অথবা ভয় যদি আকস্মিকভাবে কারো সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে, অর্থাৎ সেই বিস্ময়কর অথবা ভীতিকর ঘটনার আকস্মিকতায় অনেকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে যায়। মেয়েটি তার প্রাথমিক অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেই হয়তো চিৎকার করে উঠতে পারে তাই সুখেন ছুরিশুদ্ধু হাতটা পিছনে রেখে বাঁ হাতের প্রথম আঙুলটা আলতো করে নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়ে 'চুপ' করার মুদ্রা করল।

মেয়েটি এক পা পিছিয়ে গিয়ে ভেতরে আসবার পথটা আড়াল করে ভয়ার্ত অথচ তীক্ষ্ণ গলায় এতক্ষণে প্রশ্ন করল, 'কে আপনি ? কী চান ? কী চান এখানে ?'

মেয়েটিব কণ্ঠের জডতা কেটে গিয়ে শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা অনেক জোবালো শোনালো। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার যখন বলল, 'কী চান এখানে ? তখন তার গলায় ভয় সরে গিয়ে কণ্ঠস্বরে অনেকখানিই ফিরে এসেছে গৃহকর্ত্রীসুলভ দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব। এরকম সুদর্শনা কোন যুবতীর ব্যক্তিত্বে ভয় পাবার পাত্র সুখেন নয়। সুখেন মনে মনে ভাবছিল, এই ফ্ল্যাটের ভেতরে আর কে কে আছেন ? এতক্ষণে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া উচিত ছিল।

সুখেন মেয়েটির কথার কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে মেয়েটি এক পা এগিয়ে এসে দরজার দিকে আঙুল তুলে আদেশের ভঙ্গিতে বলল, 'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে। তা না হলে আমি দারোয়ান ডাকব।'

সুখেনের মনের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলো। সে মনে মনে সান্ত্বনা পাবার মতো করে ভাবল, 'যাক, মেয়েটা যখন দারোয়ান ডাকতে চাইছে তার মানে ওর ঘরে এমন কেউ নেই যে আমাকে তাড়াতে পারে অথবা ঠেকাতে পারে। এবার নিছক ভয় দেখাবার জন্য ছুরি শুদ্ধু ডান হাতটা সামনে নিয়ে এলো সুখেন। ছুরিটা এমনভাবে খাড়া করে ধরল নিজের চোখের সামনে যেন ছুরিটা তার কাজের পক্ষে কতখানি উপযুক্ত সেটাই সে পরখ করে দেখছে। মেয়েটি দরজা খুলে দিতেই সুখেন ঝড়ের মতো ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে খুব সামান্য সময় নিয়েছিল সে। একটু আগে এক পা এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করেছিল। এবার সুখেনের হাতে ছুরি দেখে আবার পিছিয়ে গেল। মেয়েটির চোখ-মুখে অসহায় ভাব তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ফুটে উঠছে। সুখেন এরকমটাই চাইছিল। ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। সে জানে ঈশ্বর নামক কোন শুভশক্তি

শয়তানের দুনিয়া থেকে নির্বাসিত হয়েছে অনেককাল আগেই। এখন শয়তানই সর্বশক্তিমান। অথচ আজন্মের সংস্কারবশে সে ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ দিল। যে একবার ভয় পায় তাকে ভয় পাওযানো খুব কঠিন কাজ নয়। অতএব, সুখেন ছুরির ফলাটা মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে এনে কঠোর গলায় বলল, 'কাউকে ডাকবাব দবকার নেই। আমি এখানে থাকতে আসিনি। সময় হলে নিজে থেকেই চলে যাবো। আপনি নিজেব ভালো চাইলে চুপ করে থাকবেন।'

মেয়েটিব চোখেব পাতা কেঁপে উঠল। দেয়াল ধরে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল. 'আমি চিৎকাব কবব।'

সুখেন শুকনো গলায় বলল, 'তাতে নিজেব বিপদ বাড়বে।'

মেয়েটি এবাব সত্যি সত্যি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। সুখেন সেটা অনুমান করেই মেয়েটিব মুখ চেপে ধবে হুমকি দেওয়াব গলায় বলল, 'মিথ্যে ঝামেলা কবছেন। আমি আপনার কোন ক্ষতি কবতে আসিনি। আমার একটু আশ্রয় দরকার। নিরাপদ বোধ করলে আমি নিজেই চলে যাবো।'

মেয়েটির নরম গালে হাত চেপে বেখে কথাগুলো বলল সুখেন। কথা শেষ হবাব পব মুখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'অন্তত কিছুক্ষণ আমাকে থাকতে দিন। গোলমাল করলে আমার চাইতে আপনার বিপদ বেশি।'

মেয়েটি দেযালেব গাযে পিঠ ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস নিল। বিস্ফাবিত চোখে সুখেনকে দেখতে দেখতে বলল, 'কিছুক্ষণ মানে কতক্ষণ?'

সুখেন মেয়েটিব পাশে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল. 'সেটা জানি না।'

সুখেন ছুরিটা বন্ধ করে হিপ-পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?'

মেয়েটি করুণ চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়েছিল। হরিণছানা বোধহয় এইরকম চোখ তুলেই শেষ মুহূর্তে শিকারী বাঘের চোখের দিকে তাকায়। মেয়েটি কোন উত্তব না দিয়ে পা বাড়াল। সুখেন এলো পেছন-পেছন। একটা প্যাসেজ পার হয়ে এবার ফ্ল্যাটের ভেতরে চলে এলো সুখেন। মেয়েটিকে অনুসবণ করেই আসতে হযেছে তাকে। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো ফ্ল্যাট। রঙিন পত্রিকাতে ঘর সাজাবার বিজ্ঞাপনে যে ধরনের বসবার ঘরের ছবি থাকে এই ঘরটাকে দেখলে সেই বিজ্ঞাপনেব ছবির কথা মনে পড়ে যায়। মেয়েটি একটু দূবে. অর্থাৎ পাঁচ কিংবা সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে কাচেব গ্লাসে জল ঢালছে। সোফায় বসে সুখেন সেটা লক্ষ্য করল। জলের গ্লাস নিয়ে এগিয়ে এলো সামনে। মেয়েটির হাত থেকে গ্লাস নিতে গিয়ে অস্পষ্টভাবে সে টের পেল মেয়েটির হাত কাঁপছে। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে

যাচ্ছিল ঠিকই তবুও গ্লাসটা সে তৎক্ষণাৎ মুখে তুলল না। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে এক চুমুকে জলটা খেয়ে গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল, 'আরো এক গ্লাস।'

মেয়েটি ফ্রিজের ভেতর থেকে বোতলটা বার করে আনল। সেই অবসরে সুখেন দেখল গ্লাসটার গায়ে লাল অক্ষরে একটা বিদেশী হুইস্কির নাম লেখা। মেয়েটি বোতল থেকে জল ঢেলে গ্লাসটা পূর্ণ করে দিল। এক **চুমুকে** সেই জলটুকু খেয়ে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে সুখেন সোফায় বসে সামনের ড্রেসিং টেবিলটার দিকে তাকালো। টেবিলের ওপরে ফুলদানীর ওপর টাটকা একতাড়া রজনীগন্ধা। বোধ হয় সন্ধ্যার একটু আগেই কেনা হয়েছে। ফুলদানীর পাশেই একটা ডানহিলের প্যাকেট।

সুখেনের মনে পড়ল, তার পকেটে একটা দেশলাই আছে বটে কিন্তু কোন সিগারেট নেই। এতক্ষণ সিগারেট খাবার কথা তার মনে আসেনি। প্যাকেটটা দেখে খাবার ইচ্ছাটা জাগল। সে জানে, এখন এখানে মেয়ো ভদ্রতা করার কোন মানে হয় না। মুখের সামনে ছুরি উঁচিয়ে সে ঘরে ঢুকেছে। এখন ঘরের মধ্যে নিরীহ বেড়ালছানার মতো বসে থাকলে মেয়েটা আস্তে আস্তে সাহস পেয়ে যাবে। ওর স্নায়ুর ওপর থেকে চাপ কমানো মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা। সুখেন একটু ভেবে নিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে এবং আদেশের সুরে বলল, 'আপনার ওই প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট খেতে পারি?'

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা তুলে নিল এবং ছুঁড়ে দিল সুখেনের দিকে। সুখেন দেখল কুড়িটার মধ্যে দুটো সিগারেট খরচ হয়েছে। মেয়েটি কি সিগারেট খায়? মেয়েটি এতক্ষণ পর্যন্ত ফ্ল্যাটে একা। ওর স্বামী কি আরও রাতে ফেরে নাকি সে আজ ফিরবে না? সিগারেট বার করতে করতে মেয়েটির দিকে সুখেন তাকালো। এখনকার মেয়েদের মুখ দেখে বোঝা যায় না সে কুমারী না বিবাহিতা। এই মেয়েটিকে দেখেও সে বুঝতে পারল না। সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে সে চমকে উঠল। পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। মেয়েটি এক ঝলক সুখেনকে দেখে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যাচ্ছে টেলিফোন ধরতে। সুখেন সিগারেট ধরাল না। সিগারেট ঠোঁটে চেপে ঝট করে উঠে দাঁড়াল এবং মেয়েটির পেছন-পেছন তার ঘরে এলো।

ঠিক লাল নয়, লালের মতোই, তবে কিছুটা ফিকে রঙের টেলিফোন। মেয়েটি বাঁ হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলল। মেয়েটি বুঝল, সুখেন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে এবং সুখেনের দু' চোখে ক্রূর সন্দেহ। সুখেন বুঝতে পারল, মেয়েটি যার সঙ্গেই কথা বলুক না কেন খুব সম্ভ্রম আর বিনয়ের সঙ্গে কথা

বলবার চেষ্টা করছে এবং তার কথা বলার ভঙ্গিটি ঈষৎ আড়ষ্ট। অবশ্য এর জন্য সুখেনই দায়ী। কোন মেয়ের ঘাড়ের কাছে যদি অপরিচিত কোন ভয়ঙ্কর উৎপাত ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে কারো পক্ষেই স্বাভাবিকভাবে কথা বলা সম্ভব নয়। সুখেন ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল যাবতীয় আরামের দেদার আয়োজন এই ঘরে। চওড়া ইংলিশ-খাটে নিভাঁজ এবং নিখুঁত শয্যা। এরকম বিছানাকেই বুঝি সুখ-শয্যা বলা হয়। কিন্তু এত বড় খাটে ক'জন মানুষ শোয় ? শুধু কি এই মেয়েটি ? ঘরের চারদিকে তাকাতে গিয়ে দক্ষিণের জানালাটা তার নজরে এলো। কাচের জানালার ওপারে সেই পার্কটা। পার্কটা এখন আর অন্ধকার নয়। বোধহয় লোডশেডিং কেটে গিয়ে একটু আগে আলো ফিরে এসেছে। সুখেন এগিয়ে গিয়ে জানালার কাচের ভিতর থেকে দূরের পার্কটাকে দেখল। এখন বাইরের দৃশ্য মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পার্কের যতটুকু দেখা যাচ্ছে ওইটুকু অংশে কোথাও কোন জিপগাড়ি নেই। তার মানে গাড়িটা হয়তো তার জন্যেই এই বাড়িগুলোর কাছাকাছি কোথাও এসে দাঁড়িয়েছে। জিপ গাড়িটার অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে এখান থেকে বেরুনো তার পক্ষে নিরাপদ নয়। সুখেন জানালার আরো কাছে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিল কিন্তু তাকে থামতে হল।

টেলিফোনে মেয়েটি বোধ হয় কোন প্রশ্নের জবাবে বলছে, 'না, না, এখনও কেউ আসেনি। আচ্ছা, ঠিক আছে।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখার আগে মেয়েটি সুখেনের দিকে আগুন চোখে তাকাল। মেয়েটির পেছন-পেছন বসবার ঘরে আসতে আসতে সুখেন বলল, 'আপনার এখানে কারো আসবার কথা আছে বুঝি ?'

মেয়েটি সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

সুখেন সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ছাইদানীতে ফেলে দিয়ে বলল, 'তাঁরা কারা ?'

মেয়েটি তির্যক চোখে সুখেনকে দেখে নিয়ে উত্তর দিল, 'সে খোঁজে আপনার দরকার নেই। তারা এসে পড়লে আপনারই বিপদ বাড়বে।'

সুখেন মনের ভাব গোপন রেখে মুখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, 'দেখা যাক। তাদের আসতে দিন। বিপদ কার হয় সেটা যাচাই করা যাবে।'

মেয়েটি এবার রাগের পরিবর্তে কাতর ভঙ্গি করে বলল, 'দোহাই আপনাকে, প্লিজ আপনি চলে যান। তাতে আপনারই ভাল।'

সুখেনের মনে হল, শক্তিতে পারবে না বলে মেয়েটি এবার ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাকে তাড়াতে চাইছে। এসব কৌশলের কাছে হেরে যেতে সে শেখেনি। সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে জল-কাদাশুদ্ধ জুতো পরা পা দুটো তুলে দিল

টেবিলে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আমার ভালোটা আপাতত আমাকে ভাবতে দিন। বেশি ন্যাকড়া না করে চুপচাপ নিজের কাজ করে যান। মনে রাখবেন, বিপদ এখন আমাদের দুজনের।'

মেয়েটির চোখ চিকচিক করে উঠল। নাক ফুলে উঠল উত্তেজনায়। চিৎকার করে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, 'দুজনের মানে? হোয়াট ড় ইউ মিন? আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?'

মেয়েটির উত্তেজনায় টসটসে মুখের দিকে ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে সুখেন বলল, 'মৃত্যুর। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে আপনার মৃত্যু কেউ আটকাতে পারবে না। প্লিজ, কিপ কোয়ায়েট।'

মেয়েটার শরীর বোধ হয় উত্তেজনায় আর ভয়ে অথবা অসহায় আক্রোশে শিরশির করে কেঁপে উঠল। সিন্থেটিকের ফাজিল স্বভাবের শাড়ি হঠাৎ মেয়েটির বুক থেকে ছলাৎ করে খসে পড়ে যেতেই সুখেন চোখ বুজিয়ে ফেলল। সুখেন একটু পরে চোখ খুলে দেখল মেয়েটি আয়নার পাশে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকে দেখছে। ওর দুই চোখে রাগ আর ভর্ৎসনা। সুখেন এসব গায়ে মাখল না। সে মনে মনে ভাবল, মেয়েটি যদি বুদ্ধিমতী হয়, তাহলে এতক্ষণে তার বুঝে যাওয়া উচিত সুখেন কোন চোর, ডাকাত অথবা ধর্ষণকারী নয়। এত বড় ফ্ল্যাটে একা একটা মেয়েকে খুন না করেও তার সর্বস্ব লুঠ করে নেওয়া যায়। সেই মতলবে যারা আসে তারা এতটা সময় সোফায় বসে নষ্ট করে না। মেয়েটি এইসব ব্যাপার বুঝতে পারছে কিনা সেটা সুখেন জানে না। সে লোকমুখে প্রায় প্রবাদের মতো শুনেছে, সুন্দরী মেয়েরা প্রায়শ অহঙ্কারী হয়, কদাচিৎ হয় বুদ্ধিমতী। এই মেয়েটি কি তাই?

মেয়েটি এখনও আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুখেন বলল, 'আমি আপনার কোন কাজে ডিস্টার্ব করতে চাই না। আপনি আপনার কাজ করতে পারেন।'

মেয়েটি বোধহয় একটু সাহস পেয়েছে। তাই সে স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমার এখন একটাই কাজ আপনাকে বিদায় করা।'

সুখেন বুঝল, মেয়েটি আস্তে আস্তে সাহস ফিরে পেয়ে নিজের মেজাজ খাটাতে চাইছে। আরও কিছুক্ষণ ওকে ভয়ের মধ্যে রেখে দেওয়া দরকার। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুখেন কঠিন গলায় বলল, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এই ঘরে ঢুকেছি নিজের ইচ্ছায়। নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়ে যাব।'

অসহিষ্ণু গলায় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কখন?'

সুখেন খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে এসে মেয়েটির সামনে

দাঁড়াল। এমন দূরত্বে দাঁড়াল যে আধখানা হাত বাড়ালেই সে মেয়েটিকে ধরতে পারে। মেয়েটি হয়তো পিছিয়ে যেত কিন্তু সুখেন তাকে সে সুযোগ দিল না। দুটো হাত মেয়েটির মুখের কাছে এমনভাবে মেলে ধরল যেন দু' হাতের দশটা আঙুল সে মেয়েটাকে দেখাতে চাইছে। সুখেন আগের মতোই কঠিন গলায় খানিকটা হুকুমের মতো ভঙ্গি করে বলল, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। আমি কখন যাব অথবা আদৌ যাব কিনা সেটা অনেকখানি নির্ভর করছে আপনার আচরণের ওপর। চিৎকার করে কথা বলবার চেষ্টা কববেন না। এই দশটা আঙুল কণ্ঠস্বর বন্ধ কবে দিতে জানে।'

মেয়েটি ভয় পেল ঠিকই কিন্তু যতটা ভয় পাবে বলে আশা করা গিয়েছিল ততটা নয়। সুখেনের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মেয়েটি ফিরে গেল ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। অনুমানে বোঝা যায়, সুখেন এ বাড়িতে আসবার আগে মেয়েটি ওই আযনার সামনেই ছিল। মেয়েটি এখন আয়নার ভেতর দিয়ে সুখেনকে দেখছে। সুখেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছে আয়নার মধ্যে। চমকে ওঠার মতো চেহারা নিশ্চয়ই। গালে কয়েকদিনেব শসি দাড়ি। মাথার চুলে জমে আছে বাস্তাব ধুলো আর ময়লা। জামা-প্যান্টের অবস্থাও দৃশ্যত এমন যে, তাকে যে কোন লোকই সন্দেহের চোখে দেখবে। চেহারাটাকে বদলে ফেলার জন্য কতকগুলো জিনিস দরকার ছিল, কিন্তু এখন আব সেই দরকার মেটাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আবও একটু নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত এসব জিনিস ভাবা যাচ্ছে না। নিরাপত্তার কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করবার সময় তাব মনে হল পাশের ঘরের জানালা দিয়ে পার্কের দিকটা একবার দেখবে কিনা। যে জিপ গাড়িটাকে সে এই দিকেই আসতে দেখেছিল সেই গাড়িটা কি বাড়ির সামনে অথবা পেছনে এখনও দাঁড়িয়ে? জিপ গাড়িটা এখন কোথায় সেটা জানা তার পক্ষে খুব জরুরী। সুখেনের পক্ষে নিচে নেমে সেটা দেখতে যাওয়া বোকামি হবে। একটু ভেবে নিয়ে সুখেন বলল, 'আপনার এখান থেকে বাড়ির সামনেটা দেখবার কোন ব্যবস্থা আছে?'

মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ উঠে গিয়ে বসবার ঘরের জানালার সামনে থেকে ভারি পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'এখান থেকে দেখা যায়।'

সুখেন পর্দার পাশ থেকে মুখ বার করে নিচের রাস্তার দিকে তাকালো। রাস্তার পাশে খান দুই প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে। সুখেন নিজেই পর্দা টেনে দিয়ে সোফার কাছে ফিরে আসতে আসতে বলল, 'এখান থেকে বাড়ির পেছন দিকটা দেখার ব্যবস্থা আছে?'

মেয়েটি শুধু অবাক নয় কিছুটা বিমূঢ় ভঙ্গিতে বলল, 'ছাদের ওপর একটা ঘর

আছে সেখান থেকে দেখা যায়, আর....'

মেয়েটি থেমে যেতেই সুখেন তাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আর ?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'বাথরুম থেকে।'

সুখেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'বাথরুমটা কোনদিকে ?'

মেয়েটি আঙুল তুলে একটা সাদা দরজা দেখিয়ে দিল। দরজাব গায়ে দুটো লোমশ কুকুরের ছবি। সুখেন এগিয়ে এসে বলল, 'বাথরুমের দরজাটা খুলুন।'

মেয়েটি ঢোক গিলে একবার দরজার দিকে তাকালো। সুখেন কঠিন চোখে মেয়েটিকে দেখতে দেখতে বলল, 'কী হল ? দরজা খুলুন।'

মেয়েটি যে এবার রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছে সেটা সুখেন বুঝতে পারল। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতের ধাক্কায় বাথরুমের দরজাটা খুলে দিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল। সুখেন দবজার সামনে দাঁডিয়ে মেয়েটিকে বলল, 'ভেতরে ঢুকুন।'

মেয়েটির চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। উত্তেজনায গলার শিরা ফুলে উঠল। প্রতিবাদ কবার ভঙ্গিতে বলল, 'না, আমি ভেতরে যাব না।'

সুখেন মেয়েটির হাত ধরে আচমকা টান দিয়ে বাথরুমের ভেতরে নিয়ে এলো। বেশ বড় সাইজের বাথরুম। গোলাপী রঙেব কমোটে নির্মল জল, দেযাল ঘেঁষে বাথটব, জলের কল, নানা রকমেব সাবান, অতি শুভ্র কয়েকটা তোযালে, আয়না আর কমোটেব ওপরে কাত কবে লাগানো ছোট্ট একটা পাখা। দরজা খুলতেই সুখেন টের পেয়েছিল ঘরের মধ্যেও একটা রমরমে সুগন্ধ ছড়ানো। সুখেন মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটির মুখ শুকিয়ে আসছে। সুখেন মনে মনে ভাবল, মেয়েটা কি অন্য কিছু আশঙ্কা কবছে ? কিন্তু তার জন্যে বাথরুমে আসতে হবে কেন। পাশের ঘবেই তো চমৎকার বিছানা ছিল। আসলে ভয় পেয়ে মেয়েটাব বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। সুখেন জানে, তার মনের ভেতরটা ওই মেয়েটি দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে কী হতো সেটা সে জানে না। এখন এক মুহূর্তের জনাও মেয়েটিকে চোখের আড়াল করা উচিত হবে না। সুখেন একা বাথরুমে এলে মেয়েটি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারতো কিংবা ঘরের দরজা খুলে নেমে যেতে পারতো নিচেব ফ্ল্যাটে। অতএব, কোন রকম সুযোগ সে কাউকে দিতে রাজী নয়।

সুখেন এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে নিচে তাকালো এবং বুকের মধ্যে দ্বিগুণ উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এসে বলল, 'আপনি নিজে একবার জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখুন তো লাইটপোস্টের নিচে কিছু দেখতে পান কিনা।'

মেয়েটি কোন আপত্তি করল না। আপত্তি করার শক্তি সে খুইয়ে ফেলেছে

কিংবা অচেনা আগন্তুককে নিয়ে সে যথার্থই কৌতূহলী হয়ে উঠছে। মেয়েটি জানালার সামনে থেকে নিচের দিকে তাকাল এবং ফিরে এসে বলল, 'একটা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

সুখেন বাথরুমের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বলল, 'গাড়িটার গায়ে ওয়্যারলেসের স্টিক দেখলেন ?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, 'খেয়াল করিনি। থাকলেও সেটা এখান থেকে নজরে আসবে না।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সুখেন বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। দেখা না গেলেও আমি জানি ওটা পুলিশের জিপ।'

মেয়েটির চোখে এতক্ষণ শুধু ভয় ছিল, এবার সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুখেনের সেটা দৃষ্টি এড়াল না। সুখেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ভাবল, তার খোঁজে পুলিশ কি এখানে আসবে ? পুলিশ কি সঠিকভাবে জানে সে এখানে এসেছে ? সুখেনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছিল। মেয়েটির ঘরে প্রথম পা দিয়েই সে দেখেছিল এই ফ্ল্যাটে ঘর ঠাণ্ডা করার মেশিন আছে, যদিও সেটা এখন চলছিল না। হয়তো জেনারেটর চালালে ঠাণ্ডা মেশিনটা চালানো হয় না। তাই ঘরের মধ্যে এখন শুধু পাখা চলছে। সুখেন ঘরের চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল এই ফ্ল্যাটের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকার মতো কোন গোপন জায়গা আছে কিনা। সে বুঝল, বাইরের অন্য কোন আগন্তুক অথবা পুলিশের কাছ থেকে আত্মগোপন করবার জন্য মেয়েটির সাহায্যই তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু মেয়েটি কি তাকে সাহায্য করতে রাজি হবে ? যদি পুলিশ আসে তাহলে মেয়েটি নির্ঘাৎ তার কথা পুলিশকে জানিয়ে দেবে। সেটাই স্বাভাবিক। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল সুখেন। মেয়েটিকে সে বুঝতে পারছে না। মেয়েটি ভয় পেয়েছে, বেজায় ঘাবড়ে গেছে এসব হয়তো সত্যি। কিন্তু বিপদ দরজায় এসে দাঁড়ালে মেয়েটি তাকে কোন রকম সাহায্য করবে কিনা সেটা বলা যাচ্ছে না। ভয় দেখিয়ে ওকে হয়তো আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়ে রাখা যাবে। ভয় পেয়েই সে হয়তো অনুগতের মতো আচরণ করবে। কিন্তু পুলিশের সামনে সে নিশ্চয়ই তাকে ভয় করবে না। বরং ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে ধরিয়ে দিতে তৎপর হবে।

এইবার সুখেন ঘামতে আরম্ভ করল। নাভির কাছ থেকে বুকের দিকে উঠে আসছে একটা চাপা কষ্ট। সুখেনের এরকম অনুভূতি তখনই হয় যখন সে মনে মনে নিজেকে অসহায় ভাবতে থাকে।

সুখেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়েটি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে গেছে।

প্লাক করা ভ্রূ খুব যত্নে নিপুণ করে আঁকছে। এরপর হয়তো ঠোঁটে রঙ লাগাবে। রাত্রিবেলা মেয়েটি এত সাজছে কেন সেটা সুখেন বুঝতে পারল না। মেয়েটি কি কোথাও যাবে? কিন্তু টেলিফোনে খানিক আগে যে সব কথাবার্তা বলল তাতে তো মনে হল, ওর কোথাও যাবার নেই বরং ওর এখানেই কারো আসবার কথা আছে। তাঁরা কারা? ওর স্বামীর কোন বন্ধু? বাড়িতে কি কোন উৎসব আছে? সুখেন ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছে না। এই জায়গাটা হয়তো খানিক পরেই তার পক্ষে আর নিরাপদ থাকবে না। সে খুব ভুল জায়গায় এসে গেছে। অথচ এখন বাইরে যাবারও উপায় নেই। বাড়ির নিচেই ওত্ পেতে আছে সেই জিপ গাড়িটা। সুখেনের আরেকটা সিগারেট খাবার ইচ্ছা হল। কিন্তু সিগারেট চাইতে পারল না। বাথরুম থেকে একবার ঘুরে এলে তলপেটের ভারটা হাল্কা করা যেত কিন্তু যেতে ভরসা হচ্ছে না। মেয়েটাকে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সুখেন।

মেয়েটি একচোখ বুজে অন্য চোখের কোণে কিছু একটা লাগাচ্ছিল। সুখেন ভেতরের অস্থিরতা নিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়াল কিন্তু হাতের নাগালে প্যাকেটটা পাবার আগেই ঘরের আলো আস্তে আস্তে নিভে গেল। অন্ধকারে প্যাকেটটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সুখেন বলল, 'আলো নেভাল কে?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'পাওয়ার এসে গেছে তাই জেনারেটর বন্ধ করে দিচ্ছে।'

অন্ধকারেই সুখেন হিপ-পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল তার একমাত্র অস্ত্রটা ঠিকঠাক আছে কিনা। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে রজনীগন্ধা ফুল, নানাবিধ পারফিউম আর একটি নারী শরীরের মিশ্র গন্ধ। তার এক হাত দূরত্বে অন্ধকারে বসে আছে সম্পূর্ণ অচেনা এক যুবতী। সেই যুবতীর অস্পষ্ট মূর্তি অন্ধকারে গভীর রহস্যের মতো মনে হচ্ছে। ফ্ল্যাটে ঢোকবার আগে দরজার বাইরে থেকে বেগম আখতারের গান শুনতে পেয়েছিল সুখেন। ঘরে এসে টেপটা বন্ধ করে দিয়েছিল মেয়েটি। অন্ধকারে গানের সেই সুরটা স্মৃতিতে ফিরে এলো সুখেনের। সুখেন ফস করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে ফেলেই তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে দিল। মেয়েটি অন্ধকারে ব্লাউস ফাঁক করে বুকের মধ্যে সুগন্ধ স্প্রে করছিল। দৃশ্যটা চকিতে তার নজরে আসতেই সে দেশলাই কাঠি নিভিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'সরি'!

অন্ধকারে স্প্রে করার শিইস্ শিইস্ শব্দটা সে শুনেছিল বটে কিন্তু বুঝতে পারেনি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আবার ঝুপ করে আলো এসে গেল। মেয়েটি চিরুণী আর কয়েকটা জিনিস হাতে করে শোবার ঘরে চলে গেল। সুখেন বুঝতে পারল, তার সামনে মেয়েটি যেমনভাবে সাজতে চায়

তেমনভাবে সাজতে পারছে না। পারার কথাও নয়। একজন অচেনা পুরুষের চোখের সামনে কোন মেয়েই স্বচ্ছন্দে সাজতে পারে না। সুখেনের শুধু একবার মনে হল, মেয়েটার টেলিফোনটা শোবার ঘরে। যদি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে? সুখেন প্রায় এক লাফে শোবার ঘরের দরজার সামনে এলো। মেয়েটি অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকালো। সেই চোখে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে রাগ, বিরক্তি আর অসহায়তা। বড় বিচিত্র সেই দৃষ্টি।

সুখেন দরজার কাছ থেকে সরে আসতে আসতে বলল, 'দরজাটা খোলা রাখবেন।'

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, শুধু সেই বিচিত্র দষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সুখেন দরজার সামনে থেকে সরে এলেও তার দৃষ্টি পড়ে রইল খোলা দরজার দিকে। মেয়েটি প্রথম দিকে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল এবং রাগ দেখিয়েছিল। তারপরে ভয় পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সুখেন বুঝতে পারে, মেয়েটি অপারক হয়েই তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সম্ভবত এতক্ষণে বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছে সুখেনের মধ্যে কোন বদ মতলব নেই। সে চোর কিংবা বদমাইস নয়। কিন্তু সত্যিই কি বুঝতে পেরেছে নাকি মনে মনে মেয়েটি কারো প্রতীক্ষায় আছে। অর্থাৎ মেয়েটি জানে, যাদের আসবার কথা তারা এসে গেলেই এই লোকটাকে এখান থেকে সহজে তাড়ানো যাবে। মেয়েটি তাই কিছুক্ষণের জন্য তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই বাধ্যতার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে। সুখেন খুব দ্রুত বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। কমোটের দিকে তাকাতেই তলপেটের চাপটা প্রবলভাবে অনুভব করল সুখেন। সুখেন বাথরুমের দরজা বন্ধ করল না। প্যাণ্টের চেনটা টেনে খুলে কমোটের সামনে দাঁড়াল। ঘাড়টা ঈষৎ ঘুরিয়ে রাখল এমনভাবে যাতে মেয়েটির শোবার ঘরের খোলা দরজাটা বন্ধ হলে সে বুঝতে পারে। যদিও সে জানে বাথরুমের যে জাযগাটায় সে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে ঘরের আলোটুকু ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটি খুব দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিলে তার কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু এইটুকু ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। কমোটের ভেতর থেকে এখন বিশ্রী শব্দ উঠছিল। মেয়েটি নিশ্চয়ই নিজের ঘর থেকে এই শব্দটা শুনতে পাচ্ছে এবং শব্দটা কেন হচ্ছে সেটাও সে বুঝছে। কিন্তু এসময় লজ্জা বা ভদ্রতা করার কোন মানে হয় না। মেয়েটি তাকে ছোটলোক ভাবলেও তার কিছু করার নেই। তলপেটের ভার হাল্কা হয়ে যেতে সুখেন কিছুটা স্বস্তি পেল। নিতান্তই শারীরিক স্বস্তি। কমোটের জল টেনে দিয়ে সে জানালা দিয়ে আবার নিচে তাকিয়ে দেখল, লাইটপোস্টের নিচে জিপটা নেই। তাহলে কি

জিপটা এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে ? কমোটে জল পড়ার হুস্‌স্‌ শব্দটা থেমে গিয়ে এখন মৃদু একটা শব্দ হচ্ছে। সুখেন বাথরুমের দরজা থেকে বেরিয়ে দেখল মেয়েটি তার দবজায় দাঁড়িয়ে। সুখেনকে দেখে মেয়েটি বলল, 'এবার এই দরজাটা বন্ধ করতে হবে।'

'কেন' ? বিস্ময় আর আতঙ্কে মিশে গলাব শব্দটা অদ্ভুত শোনাল।

মেয়েটি শান্ত গলায় বলল, 'আমি শাড়ি বদলাবো।'

মেয়েটির উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সুখেন সোফার দিকে হেঁটে যেতে যেতে বলল, 'বন্ধ করার দরকার নেই। ভেজিয়ে রাখুন। আমি এখানে আছি।'

মেয়েটিকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায় সেটা সুখেন জানে না। সোফার কাছে এসে বসল না। জানালার পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে নিচের দিকে তাকাল। সে যেমনটা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই। লাল বঙের একটা মারুতি গাড়ির পেছনেই জিপটা দাঁড়ানো। তার মানে জিপটা তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এই ফ্ল্যাটে আসাও বিচিত্র নয়। বরং সেটাই খুব স্বাভাবিক বলে মনে হল তার কাছে। আক্ষরিক অর্থে সে হয়তো বন্দী নয় অথচ নিজেকে স্বাধীন ভাবারও কোন কারণ নেই। এই ঘরে, এই সুদৃশ্য ফ্ল্যাটের মধ্যে সে এখন কার্যত বন্দী। মেয়েটি তাকে তাড়াতে পারলে শান্তি পায় অথচ এই ফ্ল্যাট ছেড়ে সে যেতে পারছে না। মেয়েটাও এখন ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রায় বন্দী হয়ে আছে। সুখেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারছে না। যেন একই খাঁচায় ভিন্ন জাতের দুটো পাখি ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না অথচ এমনই অবস্থা যে ছেড়ে যাওয়ারও উপায় নেই।

ঘর ঠাণ্ডা রাখার মেশিনটা এখনও চালু করেনি মেয়েটি। পাখার হাওয়ায় ঘরের মধ্যে শুধু শোঁ-শোঁ শব্দ। সুখেন বুঝতে পারল তার চারপাশে বিপদ বেড়ে চলেছে। একটু পরে এই আশ্রয় তাকে ছাড়তে হবে, ছাড়তেই হবে। অথচ নিচে নেমে যাওয়ার উপায় নেই। সুখেনের মধ্যে দুঃসাহস মাথাচাড়া দিয়ে জাগতে লাগল। কিছু একটা উপায় তাকে বার করতে হবে। কিন্তু সেটা কী ?

উপায়টা ভেবে বার করবার আগেই বিপদটা বুঝি দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার বেল টিপছে কেউ। ঘরের মধ্যে মিষ্টি বাজনার আওয়াজ উঠছে। সুখেন বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে চকিতে সরে গেল শোবার ঘরের দিকে। শব্দটা মেয়েটিও শুনেছে। শাড়ির কুঁচি নিখুঁত করার কাজে সে তখন মনোযোগী। এ বাড়ির কোন অতিথি যিনি সদর দরজার বেল বাজিয়ে আসতে চান তার সম্পর্কে মেয়েটির কোন ভয় থাকবার কথা নয়। বরং এখন যে কোন আগন্তুকই মেয়েটির পক্ষে মঙ্গলজনক। সুখেনের ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো।

মেয়েটি যখন ঘরের দরজা থেকে বেরিয়ে এল তখন দ্বিতীয়বার বেল বাজানো হয়ে গেছে। মেয়েটি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুখেন এক লাফে তার সামনে এসে দাঁড়াল। হিপ-পকেট থেকে ছুরিটা বার করতে করতে বলল, 'আমি এখানে আছি কথাটা কাউকে বলবেন না।'

মেয়েটি অভিব্যক্তিহীন মুখে কথাটা শুনে চলে গেল দবজার সামনে। দরজার গায়ে আই হোল লাগানো আছে। মেয়েটি তাতে চোখ রেখে আগন্তুককে দেখল। চোখ সরিয়ে নেবাব সঙ্গে সঙ্গে সুখেন জিজ্ঞেস কবতে যাচ্ছিল 'কে' ?

কিন্তু তার আগেই মেয়েটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুলিশ'।

বুকের মধ্যে বাজ পড়ার মতো অবস্থা সুখেনের। বেশিক্ষণ ভাববার সময় ছিল না। ছুরিটা মেয়েটির গলাব কাছে তুলে এনে বলল, 'পুলিশকে বলবেন এখানে কেউ আসেনি। যদি আমাব কথা বলে দেন তাহলে····

কথা শেষ না করে ছুরিটা শুধু মেয়েটিব দিকে তুলে ধরে সুখেন সরে যেতে যেতে বলল, 'ছাদে যাবাব সিঁড়িটা কোনদিকে' ?

মেয়েটি হাত তুলে দরজা দেখিয়ে বলল, 'ওই দবজা খুললেই ওপরে যাবার সিঁড়ি।'

সুখেন দরজা খুলে সিঁড়িব মুখে এল। মেয়েটা হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সে নিজে এসে দরজাটা বন্ধ কবে দিয়ে চলে গেল। বন্ধ দরজাব এপার থেকে ভেতরের ঘবের কিছুই দেখা যাবে না। কিন্তু কান পাতলে কি কোন কথা শোনা যাবে ? সুখেন দরজায় কান পাতল।

মেয়েটি বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছে। টুকরো টুকবো কথা শোনা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না বটে শুধু কথা শুনে ঘবের ভেতরকাব দৃশ্যটা সে ভেবে নিচ্ছে।

মেয়েটির কণ্ঠস্বব শোনা গেল, 'এখানে' ?

একটি মোটা গলার পুরুষ কণ্ঠ, সম্ভবত পুলিশেব কণ্ঠ, 'হ্যাঁ, তখন এদিকটায় লোডশেডিং ছিল। কোন অন্ধকার বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে ভেবে অন্য বাড়িগুলো দেখেছি। এখানে আলো ছিল তাই··

মেয়েটি বলছে, 'এখানকার ফ্ল্যাটে নতুন কেউ এলে নিচের দরোয়ানরা জানতে পারে।'

পুলিশের কণ্ঠ, 'তারা তো কাউকে আসতে দেখে নি। লিফটম্যানও কাউকে দেখেনি।'

মেয়েটির গলায় এবার বিরক্তি, 'তাহলে কেন শুধু শুধু এখানে এলেন ?'

পুলিশ অফিসার বোধহয় উত্তর দিতে সময় নিচ্ছে। গলা এবং বুক ঘেমে

যাচ্ছে সুখেনের। জায়গাটা চারপাশ থেকে আটকানো, ফলে একবিন্দু হাওয়া নেই। বুকের মধ্যে উত্তেজনাটা আগুনের গোলার মতো দাপাদাপি করছে আর সারাবুকে আগুনের ফুলকিব মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠা।

পুলিশ অফিসারটি বলছে 'আপনার ফ্ল্যাটটা একটিবার দেখব ?'

নিঃশ্বাস বন্ধ কবে সুখেন মেয়েটিব জবাবেব প্রতীক্ষা করছে। তাকে ফ্ল্যাট থেকে তাড়াবার সুবর্ণ-সুযোগ এসে গেছে মেয়েটির সামনে। মেয়েটি কি শেষ মুহূর্তে মত বদলে ফেলে পুলিশকে সব বলে দিচ্ছে ?

মেয়েটি কথা বলছে 'নিশ্চয়ই দেখতে পারেন। কিন্তু তার জন্য এই ফ্ল্যাটটি যাঁব তার কাছে অনুমতি নিতে হবে। আমার ঘরে টেলিফোন আছে ; আপনি টেলিফোন কবে পারমিশনটা নিয়ে নিতে পারেন।'

পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করল, 'ফ্ল্যাটটা কার ? আপনাব নয়'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'আমি কয়েকদিনের জন্য আছি এই পর্যন্ত। ফ্ল্যাটটি সুরেশ মালহোত্রার। নাম জানেন নিশ্চয়ই !'

পুলিশ অফিসারের মুখটা দেখা গেল না কিন্তু তার বিগলিত কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল সে দমে গেছে। অফিসারটিব বিগলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'ওহোঃ মিস্টার মালহোত্রা, ইউনাইটেড শিপিং কর্পোরেশন অ্যাণ্ড...

মেয়েটি যেন অফিসারের মুখের কথা সম্পূর্ণ কবে দেবার মতো করে বলল, 'আদারস ফিফটিন বিজনেস। নাউ হি ইজ এ নামবাব টু বিজনেস ম্যাগনেট...

বিগলিত পুরুষ কণ্ঠটি আরও বিগলিত হয়ে উচ্চারণ করল, 'আই নো, আই নো। দ্যাটস অলরাইট। আই এ্যাম সরি টু ডিসটার্ব ইউ।'

ওরা বোধহয় নিঃশব্দে চলে গেল। মেয়েটি ঘরের দরজা বন্ধ করল কিনা বোঝা গেল না। এবার তার সামনেব দরজাটা খুলে না দিলে সে ভেতরে আসতে পারছে না। কিন্তু মেয়েটি দেরি করছে কেন ? পুলিশের কাছে সুখেনের কথা সে ইচ্ছে করলেই বলতে পারত কিন্তু কেন বলল না ? ভয়ে ? পুলিশের সামনে মেয়েটির ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে এসে খুব সহজেই তাকে ধরতে পারতো। হিপ পকেটে রাখা ওই অস্ত্রটা দিয়ে বন্দুকধারী পুলিশের মোকাবিলা করা যায় না। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় সে বড় জোর ঘৃণার চোখে মেয়েটির দিকে তাকাতো। কিন্তু তাতে এই সুদর্শনা যুবতীর কী আর এমন ক্ষতি হতো। তাহলে কি মেয়েটি ভয় পেয়ে সত্যি সত্যি ভেবেছে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার আগে সুখেন তাকে খুন করতে পারে ? কিংবা এমনও ভাবতে পারে সুখেন একা নয়, তার দলের লোকেরা বাড়িটার আশে-পাশেই গা ঢাকা দিয়ে রয়ে গেছে। সুখেন এই বাড়ি থেকে ধরা পড়লে

তার দলের লোকেরা সময় বুঝে উঠে আসবে বদলা নিতে। মেয়েটি কী ভেবে পুলিশকে মিথ্যা বলে ফিরিয়ে দিল সেটা সুখেন জানে না। কিন্তু মেয়েটির এই আচরণে সে মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলো।

কিন্তু মেয়েটা এখনও দরজা খুলছে না কেন ? পুলিশের লোক নিচে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত কি মেয়েটা অপেক্ষা করছে। ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, পুলিশের কাছে মিথ্যা বলার জন্য এবার মেয়েটির দায়িত্ব আগের চাইতে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আগে তো কোন দায়িত্বই ছিল না। এখন মিথ্যাটা বলে ফেলে তাকে সতর্ক হতে হচ্ছে। সুখেনের উপস্থিতি অথবা তার অস্তিত্বকে আড়াল করার দায় এখন মেয়েটিরও কম নয়। সুখেন মনে মনে খুশি হল এই ভেবে যে, যেভাবেই হোক মেয়েটাকে সে খানিকটা আয়ত্তে আনতে পেরেছে। মেয়েটাকে ভয় দেখাবার আরও একটা অস্ত্র আবিষ্কার করতে পেরে সে খানিকটা উল্লাসবোধ করল। এবার সে মেয়েটিকে অনায়াসেই বলতে পারবে, পুলিশের কাছে মিথ্যা বলার অপরাধে সেও বেজায় অপরাধী। অতএব, পুলিশ তাকে ধরলে মেয়েটিরও কিছুটা জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। সুখেন দরজার গায়ে আবার কান পেতে রাখল। সে বুঝতে পারছে না মেয়েটা এখনও দরজা খুলছে না কেন ? মেয়েটি কি অন্য কোন ফন্দি বার করছে ?

সুখেন আস্তে করে দরজার গায়ে টোকা দিল। মেয়েটি বোধহয় দরজার কাছাকাছিই ছিল। চাপা গলায় বলল, 'অপেক্ষা করুন। ওরা নিচের ফ্ল্যাটে সার্চ করছে।'

কৃতজ্ঞতা এক ধরনের স্বস্তি অথবা সুখ দেয়। সুখেনের মধ্যে সেইরকম একটা বোধ জেগে উঠল। জোরে করে শ্বাস ফেলতে গিয়ে তার চোখ বুজে এলো। চোখ বন্ধ করেও সে যেন এখন মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছে। যার লাল ঠোঁটের ভেতরে ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। ঘরে পা দিয়ে একবারও সে মেয়েটিকে হাসতে দেখে নি। দেখবার মতো অবস্থা অবশ্য ছিল না। কিন্তু বুঝতে পারল এরকম মেয়েরা হাসলে অপরূপা দেখায়। মেয়েটা তাকে এখন আড়াল দিয়ে নিরাপদ করতে চাইছে—ব্যাপারটা অবাক করার মতো। কিন্তু আরও অবাক হওয়ার মতো ঘটনা যে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল সেটা টের পাওয়া গেল দরজা খোলার পর।

॥ ২ ॥

'আপনার নাম ?'

'সুখেন মুখার্জি।'

'বয়স' ?'

'ঠিক জানি না।'

'তার মানে ?'

'মানেটা আমার বাবা জানেন। আমার জন্মের তারিখের সঙ্গে স্কুল সার্টিফিকেটের তারিখ মেলে না।'

দারোগার মুখে একটা থমথমে ভাব ছিল। দারোগাদের মুখগুলো ঠিক এরকমই হয় কিনা সেটা সুখেন জানে না। কারণ সে বেশি দারোগা দেখে নি। সেই থমথমে মুখে এবার কৌতুকের ঝিলিক দেখা দিল। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বলল, 'স্কুল সার্টিফিকেটে কত বয়স ?

সুখেন দারোগার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে উত্তর দিল, 'ওখানে বয়স থাকে না, জন্মের তারিখটা থাকে। আমার বাবা যেটা ভুল করে রেখেছেন।'

দারোগাবাবুর কণ্ঠস্বর ঈষৎ নরম হল। সেই গলাতেই বলল 'আপনি জানেন না আপনি কতবড় বাপের ছেলে। কত বিরাট বংশ আপনাদের ! বাবাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন। আপনি অমলেন্দুবাবুর ছেলে না হলে আপনাকে কেসে ঝুলিয়ে দিতাম।'

সুখেন মনে মনে উচ্চারণ করল, 'খচ্চর।'

দারোগাবাবু সিগারেট ধরাল। নতুন ক্লাসিকের প্যাকেটটা পয়সা দিয়ে নিশ্চয়ই কেনেনি, কারো কাছ থেকে পেয়েছে। এখন সেই সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আপনার অ্যাকটিভিটিস সন্দেহজনক। আজে-বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করতে হবে। এটাই আমার ফার্স্ট এবং লাস্ট ওয়ার্নিং। শুধু আপনার বাবার রিকোয়েস্টে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিলাম।'

থানা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সুখেন ভাবল, বাবা নিশ্চয়ই কিছু টাকা-পয়সা দিয়েছে। টাকা খেয়ে ছেলের সামনেই বাপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। আমার বাপকে আমার চাইতে দারোগা বেশি চেনে। চেনবারই কথা। কলকাতার বড় চাকুরে, মায়ের নামে ব্যবসা, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এমন লোকের সঙ্গে দারোগাদের খাতির থাকাই স্বাভাবিক। থানার বাইরে হরিকাকা

রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় মা পাঠিয়ে দিয়েছে। হরিকাকা লোকটাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আরামবাগের দিকে কোথায় যেন থাকতো। সে সব অনেককাল আগের কথা। সুখেন জন্মাবার অনেক আগে নিতান্ত বালক বয়সে জ্যাঠামশাই ওকে এনেছিলেন বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য। সেই থেকে এখানেই থেকে গেছে। প্রায় ক্রীতদাসের জীবন। নগদ পয়সা দিয়ে হরিকাকাকে কিনতে হয়নি। লোভ দেখিয়ে একদা তাকে আনা হয়েছিল এই বাড়িতে। একটু বড় হলে কলকাতায় চাকরী করে দেবে জ্যাঠামশাই। কিন্তু কিছুই হয়নি। মা বলে, 'হরিদা আমাদের পরিবারের একজন।' কথাটা যে ঠিক নয় সেটা বাড়িশুদ্ধু সবাই জানে, বোধহয় হরিকাকাও। বুঝতে পারে না বলে এখনও কিছু বলতে পারে না। বাবা বলেন, 'হরি লোকটা ভাল. কিন্তু বুদ্ধি নেই। একটা কথা পাঁচবার বললে তবে বোঝে।'

সুখেন মনে মনে ভাবে, 'ভাগ্যিস বুদ্ধি কম তাই থেকে গেছে। বুদ্ধি থাকলে কবেই পালাতো। বিয়ে-থা করে সংসার করতে পারতো। অন্তত নিজের জীবনটা অন্যের অনুগ্রহ আর দয়ার ওপর নির্ভর করে চালাতো না। সুখেনকে দেখে হরিকাকা নিজেই এগিয়ে এল। এসে হাত ধরল। জিজ্ঞেস করল, 'বেশি বকাবকি করে নি তো?'

সুখেন রিকশায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কোথায় রে?'

হরিকাকা জবাব দিল, 'বাড়িতে বসে ফোন করছিলেন, ফোন করে দারোগাবাবুকে বললেন, একটু বর্কেটকে ছেড়ে দিন।'

সুখেন হরিকাকার মুখের দিকে তাকালো। লোকটা সত্যিই বোকা। সারল্য এ যুগে বোকামি হয়ে যায়। সততাকে বলা হয় ভীরুতা অথবা নির্বুদ্ধিতা। সরল সত্যটা হরিকাকা বলে দিয়ে সুখেনের অনুমানকেই সত্যে পরিণত করে দিল। সুখেন এমনটাই ভেবেছিল। কলকাতার কলেজের হাঙ্গামা নিয়ে বারাসাতের দারোগার এত মাথাব্যথা থাকবার কথা নয়। এখানে যাদের সঙ্গে সে মেশে তারা কেউই তার বাপ-জ্যাঠাদের থেকে খারাপ লোক নয়। বাপ-জ্যাঠাদের যারা বন্ধু তারা যে কেন এখনও জেলের বাইরে আছে সেটাই সুখেন বুঝতে পারে না। মাঝে মধ্যে অনেক রাত্রে নিজের বিছানায় ছটফট করতে করতে তার মনে হয় এখনই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে এই বাড়িটা চুর-চুর করে ফেটে যাক। তখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'টাওয়ারিং ইনফার্নো' ছবিটার শেষ দৃশ্যের কথা। খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, গুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে একটি প্রাসাদ। শূন্যে নিরালম্ব হয়ে উড়ে যাচ্ছে চেয়ার, টেলিফোন আরও সব প্রিয় সামগ্রী। ওই রকম একটা বিস্ফোরণ দরকার। শহরের সর্বত্র অবাঞ্ছিতদের রমরমা জলসা চলছে।

সেই আসর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে সাধ হয় সুখেনের। সে জানে না, কখনও সেই বিস্ফোরণ ঘটবে কিনা। কিন্তু থেকে থেকে তার বুকের মধ্যে ভূমিকম্প ঘটে যায়। ভূমিকম্পের ভেতর দিয়ে সে তার বাবা-জ্যাঠাকে দেখে। সুখেনের তখন মনে হয় তার বাবা-জ্যাঠারা যেন আদিমকালের নিষ্ঠুর পুরুষ। যারা মানুষকে হত্যা করে সেই মৃতদেহের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যায় সামনের দিকে। তাদের পায়ের চাপ সুখেন টের পায়।

রিকশাটা বাড়ির সামনে এসে থামতেই হরিকাকা প্রথমে নামল। পকেট থেকে টাকা বার করে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে গিয়ে বিজয় গর্বে ডাকল, 'মেজবৌদি, মেজবৌদি।'

মা'কে মেজবৌদি এবং জেঠিমাকে বড়বৌদি বলে ডাকে হরিকাকা। সে হয়তো ভেবেছিল ছোটকাকা বিয়ে করলে তাকে 'ছোটবৌদি' বলে ডাকতে হবে তাই ওই ডাকটা সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ছোটকাকা বিয়ে করেন নি। সাধু-টাধু হয়ে কোথায় নাকি চলে গেছে। ছোটকাকা যখন নিরুদ্দেশ হয় অথবা সাধু হবার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন সুখেনের বয়স মাত্র দশ। অতএব, ব্যাপারটা তার মনে আছে।

সুখেন যখন রিকশা থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে তখন মা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। জেঠিমা এই সময় তুলসীতলায় তিন ঘটি জল ঢেলে প্রায় ছত্রিশবার ঢিপ ঢিপ করে তুলসী মঞ্চে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তার সম্ভবত জল ঢালা হয়ে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে অতি দ্রুত প্রণাম সারতে সারতে ওরই মধ্যে একবার সুখেনকে দেখে নিল। সুখেন বারান্দায় ওঠবার আগে দেখল দোতালায় নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা চুরুট টানছেন। সুখেন মনে-মনে ভাবল, বাবা অত্যন্ত পাকা খেলোয়াড়। কিন্তু হরিকাকা বোকামি করে খেলাটা সুখেনের কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। সুখেন কারো সঙ্গে কথা বলল না। নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসে পড়ল। মা এলো সুখেনের পেছন-পেছন। সুখেন জানতো, মা আসবে। মা বলল, 'কী জিজ্ঞেস করল? মার-ধোর করেনি তো?'

সুখেন মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল, 'বাবাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।'

সুখেন ভেবেছিল সে তার কণ্ঠের মধ্যে রাগ ফুটিয়ে তুলবে। কিন্তু কথাটা বলবার পর বুঝল, রাগ নয়, তীব্র অভিমান তার গলায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু অভিমান কেন? কার ওপর তার অভিমান?

মা এগিয়ে এসে মাথায় হাত রাখল। সুখেন জানে, তার মাথায় এমন করে মা কিংবা বড়মা হাত রাখলে তার সব তছনছ হয়ে যায়। রাগ অথবা আক্রোশ কিছুই

সে ধরে রাখতে পারে না।

মা সুখেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোর বাবা এখনও স্নান করেনি, খায়নি। কেবলই ঘর-বার করছে। কতবার তো থানায় ফোন করবার চেষ্টা করল। যা একবার গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে আয়।'

সুখেন যতক্ষণ দারোগাব মুখেব সামনে বসেছিল ততক্ষণ কোন ফোন দারোগাব কাছে যায়নি। বাবা যা কববার সেটা আগেই করে রেখেছেন। সুখেন চেয়াব থেকে উঠে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মা অবাক গলায় বলল, 'সে কি, আবার শুয়ে পড়লি কেন। যা ওপরে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে আয়।'

সুখেন পাশ ফিবে শুতে শুতে বলল, 'বাবা আমাকে দেখেছে। আবার গিয়ে দেখা করবার মতো কিছু ঘটেনি। তুমি তোমার কাজে যাও।'

মা একটু অপেক্ষা করে চলে গেল। চলে যেতে যেতে প্রায়ই যেমন বলে আজও তেমন কবে বলতে বলতে গেল, 'কেমন ধারা মতিগতি যে তোদের হচ্ছে। লেখাপড়া শিখে খালি অবাধ্য হচ্ছিস।'

সুখেন জানে সে যদি স্বভাবে হরিকাকার মতো হতো তাহলে তাকে নিয়ে হয়তো বাবার তেমন কোন ক্ষোভ থাকতো না। কিছুটা নির্বোধ এবং সরল। এইরকম মানুষ বাবা আর জ্যাঠার বেজায় পছন্দ। সুখেনকে তারা চেয়েছিল তাদের মতো নিষ্ঠুর হিসেবী এবং কৌশলী করে গড়ে তুলতে। কিন্তু সুখেন সেটা হতে পারছে না। হতে না পাবলে বাবাব এতটা রাগ হতো না, সুখেন হতে চাইছে না বলেই বাবার বাগটা বেশি। অথচ বংশের একমাত্র ছেলে বলে সুখেনকে তাড়াতেও পাবে না। জ্যাঠামশাইয়ের এক মেয়ে মিলি। বছর দুই আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। এই পরিবাবে এখন একমাত্র বংশধর সুখেন। ঠাকুমা যখন মারা যায় তখন সুখেনের বযস সাত বছর। মরবার আগে নাতির মাথায় হাত রেখে দেদার আশীর্বাদ করে গেছেন। বংশের একমাত্র উত্তবাধিকারী। ঠাকুমার ভাষায় 'শিবরাত্রির সলতে।' ছোটকাকা তখনও এ বাড়িতে। বিয়ে-থা করার কোন আগ্রহ তাব মধ্যে ছিল না। জেঠিমা পালা-পার্বণে সুখেনের মাথায় হাত বুলিয়ে, কপালে চুমু খেয়ে বলতেন, 'বালাই ষাট! বাছা আমার একশো বছর পরমায়ু পাক। বংশের একমাত্র ছেলে। তোর ওপরেই তো ভরসা।'

তখন কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগতো না। এখন খারাপ লাগে। খারাপ লাগে, কারণ সে জানে এই বংশের কোন উত্তরাধিকার তাকে বহন করতে হবে। বংশটা যে কতবড় তার কিছু প্রমাণ জ্যাঠামশায়ের সিন্দুকে খুঁজলে এখনও পাওয়া যাবে। বংশটা অতিশয় বড় বলেই পাপ আর অন্যায়ের পরিমাণটাও অনেক। ছোটকাকা যদি সাধু হয়ে না যেতেন তাহলে তাকেও বাবা-জ্যাঠাদের

দলে ভিড়তে হতো। বেচারি পালিয়ে বেঁচেছে। সাধু হলেই শান্তি পাওয়া যায় কিনা সে কথা সুখেন জানে না। তবে এবাড়িতে থাকলে তাকে যা হতে হতো তার চাইতে ছোটকাকা নির্ঘাৎ ভালো আছেন। কিন্তু সুখেন পালাতে চায় না। বাড়ির সমস্ত নিয়ম সে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে চায়। এই নিয়মভাঙ্গা নিয়েই বাবার সঙ্গে তার প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে। হস্টেল থেকে ফিরেই বুঝল কিছু একটা ঘটেছে বারান্দার এককোণে পদ্মপিসি দেয়ালের দিকে মুখ রেখে কাঁদছিল। পদ্মপিসি এ বাড়িতে কাজ করছে অনেকদিন। ওর স্বামী কোন একটা দোকানে কাজ করতো সেই দোকানে ডাকাতি হওয়ার পর ওর স্বামীকেও পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। বাবা কিংবা জ্যাঠা চেষ্টা করলে ওর স্বামীকে ছাড়াতে পারত কিন্তু সে চেষ্টা করেনি। পদ্মপিসি বাবার পায়ে ধরে কেঁদেছিল তবুও সে কান্নায় বাবা টলে নি। বাবার সেই এক কথা, 'আইনের বিচার মাথা পেতে নিতে হবে। নির্দোষ হলে তো খালাস পাবেই।'

বাবা জানতেন সব নির্দোষীরাই খালাস পায়না। কিন্তু এব্যাপারে বাবা কোন পক্ষ নেন নি দেখে তাঁর ওপর সুখেনের রাগ হয়নি। রাগটা হল এখন। বাবার হুকুম, পদ্মপিসিকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু বাবা বুঝলেন না, পদ্মপিসি এখন এই অবস্থায় কোথায় যাবে। তার পেটে ন' মাসের সন্তান। যেকোন দিন ব্যাথা উঠতে পারে। একা-একা মেয়েটা করবে কী? যাবে কোথায়? মা বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাবা বোঝে নি। আসলে কোন বাড়তি ঝামেলা পোয়াতে বাবা রাজী নয়। পদ্মপিসির চলে যাওয়ার সময়টাতেই সুখেন বাড়ি ঢুকল এবং সমস্ত বিবরণ শুনে নিয়ে জেদের গলায় বলল, 'পদ্মপিসি থাকবে।'

জেঠিমা অবাক হয়ে বলল, 'বলছিস কি! তোর বাবা তো একদণ্ডও রাখবে না। ফিরে এসে দেখলে কুরুক্ষেত্র বাধবে।'

সুখেন মা আর জেঠিমাকে দেখে নিয়ে বলল, 'সেটা আমি বুঝবো। পদ্মপিসি এখানে থাকবে। ওর এ সময় যাওয়া চলবে না।'

খানিক পরে মা এসে সুখেনকে বোঝাল, 'খোকা, এত জেদ করিস নি। তোর বাবার মেজাজ তো জানিস। পদ্মকে যেতে দে। আমি না হয় কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি ওর হাতে।'

সুখেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বলল, 'আমার বাবার মেজাজের ওপর একজন মহিলা আর তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করতে পারে না। যে মহিলা তার এই শরীর নিয়েও গতকাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য কাজ করে গেছে তার হাতে বিশ-পঞ্চাশটা টাকা দিলেই বুঝি সব দায় শেষ হয়ে যায়? মা উদ্বেগের

গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে পদ্মকে নিয়ে তুই কী করতে চাস ?'

সুখেন দেখল তার জবাব শোনার জন্য জেঠিমাও এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। সুখেন আগের গলাতেই জবাব দিল, 'যা করা উচিত তাই করতে চাই। ওকে কোন একটা হাসপাতালে ভর্তি করাবার দায়িত্ব আমাদের। সেখান থেকে খরচ মিটিয়ে ওকে সুস্থ করে তোলা পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব। তারপর যদি সে নিজের ইচ্ছায় চলে যেতে চায় যাবে।'

জেঠিমা ঘরে এসে বলল, 'খোকা তো বলছে ঠিক কথাই। কিন্তু ওর বাবা-জ্যাঠা এসব পছন্দ করবে না। আমার বাপু খোকার কথাতেই সায়। ছোট কি বলছিস ?'

মা'কে জেঠিমা 'ছোট' বলে ডাকে। মা, চারদিকে ভয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'সায় থাকলে তো হবে না, সামলাবে কে ? ওদের কথার তো নড়চড় হবার জো নেই।'

সুখেন কণ্ঠে ঝাঁঝ ফুটিয়ে বলল, 'আমার আপত্তি ঠিক এইখানটাতে। বাড়ির সবাইকে ওরা মনে করে চাকর-বাকর। ওদের হুকুমটাই যেন শেষ কথা। কারো কোন পরামর্শ নেবার দরকার বোধ করে না। পদ্মপিসির ব্যাপারে তোমাদের মতামত নেওয়ার দরকার ছিল না ?'

জেঠিমা মুখে ব্যাজার ভঙ্গি করে বলল, 'ছিল তো কিন্তু নিল কৈ ? এবাড়ির পুরুষরা বৌদের সঙ্গে পরামর্শ করে না। আমরাও তো বিনে মাইনের দাসী বই অন্য কিছু নই।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই বাবার ঘরে ডাক পড়ল সুখেনের। ঘরে ঢুকেই দেখল বাবার মুখের চেহারা অন্যরকম। বাবা কোন ব্যাপারেই ভণিতা পছন্দ করে না। তাই সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'পদ্মকে আমি চলে যেতে বলেছিলাম। তুই তাকে থাকতে দিলি কোন সাহসে ?'

সুখেন নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। শান্ত গলাতেই বলল, 'ওকে থাকতে বলার জন্য সাহস লাগবে কেন ? আমি বললাম, ও থেকে গেল।'

বাবা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি ওকে যেতে বলেছিলাম।'

একই রকম শান্ত গলায় সুখেন বলল, 'কিন্তু আমি ওকে থাকতে বলেছি।'

বাবা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি আগুনের মতো দগদগে। বাঁ হাতে টেবিলে চাঁটি মেরে বলল, 'কেন বলেছিস ? তুই জানিস না আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তোর এত বড় সাহস আমার সিদ্ধান্তের...'

সুখেনের মনে হল বাবা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। তাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্যই সুখেন বলে উঠল, 'তোমার সিদ্ধান্তটা ভুল এবং অমানবিক। আমারটা সে

তুলনায় অনেক ঠিক।'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বাবা অর্থাৎ অমলেন্দু মুখার্জি সুখেনের মুখের দিকে তাকাল। সে বিশ্বাস করতে পারছে না এই বাড়িতে তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তার সিদ্ধান্তকে কেউ ভুল বলতে পারে। অমলেন্দুর বুকের মধ্যে উত্তাল ক্রোধ ফণা তুলতে লাগল। অমলেন্দু কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার সিদ্ধান্ত ভুল কিংবা ঠিক সে বোঝার দায় তোমার নেই। আমি যা বলব সেটাই এবাড়িতে হবে। এটাই বাড়ির নিয়ম।'

সুখেন একটুকুও উত্তেজনা না দেখিয়ে বলল, 'আমি তো বড় হচ্ছি, তাই নিয়মগুলো একটু বদলে দিচ্ছি।'

অমলেন্দু গর্জন করে উঠে বলল, 'শাটআপ! আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তর্ক করতে লজ্জা হচ্ছে না? একটা ডাকাতের বৌকে আমি বাড়িতে রাখব তাই না? আমার কোন সোস্যাল প্রেস্টিজ নেই। দশটা লোক আমার সম্পর্কে বলাবলি করবে না।'

সুখেন ধৈর্য রাখতে পারছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই চিৎকার করে বাবাব চাইতে দ্বিগুণ জোরে সে বলে ওঠে, ডাকাতের বৌ এই কথাটা কি আজই জানলে? দু'মাস আগে কেন যেতে বল নি। নতুন লোক জোগাড় হতেই ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। গতকাল পর্যন্তও ওর শ্রমটুকু নিতে তোমার আটকায় নি।

কিন্তু সুখেন চিৎকার করল না। টেবিলের দিকে মুখ রেখে বলল, 'ওর স্বামীকে সন্দেহ করে ধরা হয়েছে। আর যদি ডাকাত হয়েও থাকে তাতে পদ্মপিসির দোষ কোথায়? ওর এখন কেউ নেই বলেই আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। পদ্মপিসি সন্তান-সম্ভবা। এ সময়—

অমলেন্দু তীব্র চোখে সুখেনকে দেখে নিয়ে বলল, 'এ সময় আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। ও কাল সকালেই চলে যাবে। বাড়ির একটা মঙ্গল-অমঙ্গল আছে। ডাকাতের বৌ আর তার ছেলের…'

সুখেন কাতর গলায় বলল, 'বাবা, পদ্মপিসির বর ডাকাত নয়। সন্দেহক্রমে ধরা হয়েছে। ওরকমভাবে তো অনেককেই ধরে।'

অমলেন্দু চুরুট মুখে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি বার করতে করতে বলল, 'লোকের সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়। তার মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে।'

সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল সুখেনের। পদ্মপিসির অসহায় মুখ, তার কান্না ভেজা চোখ বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। সুখেন হঠাৎ বলে ফেলল, 'বহু লোক তো সন্দেহ করে তুমি মিউনিসিপ্যালিটির টাকা মেরেছো। একটা লোক্যাল

পেপারে তো সিমেন্ট বিক্রি আর টেণ্ডারের কেচ্ছা বেরিয়েছে। তাহলে কি সেটাও সত্যি ?'

ক্রোধ আর অতিরিক্ত উত্তেজনা বোধহয় মানুষকে হঠাৎ বোবা বানিয়ে দেয়। অমলেন্দুও হঠাৎ বোবা হয়ে গেল। কিন্তু সেটা কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। পরক্ষণেই তার গলা চিরে বেরিয়ে এলো বজ্রপাতের মতো ভয়ঙ্কর একটা গর্জন। গোটা বাড়ির লোকের পক্ষে চমকে ওঠার মতো সেই আওয়াজ। সুখেন আর ঘরে দাঁড়িয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। সে থমথমে মুখে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এল। দোতলার বারান্দা থেকে বাবার গর্জন শোনা গেল, 'হরি, রিকশা ডেকে এখনই পদ্মকে বার করে দে। আমার হুকুম।'

সুখেনের রক্তে তখন জেদ চেপে গেছে। অন্ধ আক্রোশ অপমানের ছোঁয়া পেয়ে বুকের মধ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠছে। জেঠিমা ছুটে এসে বলল, 'খোকা, জেদ করিস নি। পদ্ম চলে যাক। তোদের জেদাজেদিতে মেয়েটার বিপদ বাড়বে।'

মা ততক্ষণে ওপরে উঠে গেছে বাবার কাছে। বাবার মুখের ওপর কথা বলবার সাহস মা'র নেই। সুখেন দেখল দোতলাব বাবান্দায় রেলিং-এর কাছে বাবা দাঁড়িয়ে। তার চোখ নিচের উঠোনের দিকে। মা' বাবাব পাশে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা দৃশ্যপটটা রীতিমতো নাটকীয়। বারান্দার কোণে সিঁড়ির নিচে যেখানটায় পদ্মপিসি ইদানিং থাকতো সেই জায়গায় উবু হয়ে বসে নিজের টিনের স্যুটকেশটা কোলেব কাছে আঁকড়ে ধবে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে পদ্মপিসি হরিকাকার দিকে তাকিয়ে। হরিকাকা মেজকর্তার হুকুম তালিম করতে রিকশা ডাকতে যাবার জন্য সদর দরজার দিকে এগোচ্ছে, বাবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দোতলা থেকে ছিটকে পড়ে স্থির হয়ে আছে উঠোনের ওপর। পেছনে এক মধ্যবয়সী নারীর বেদনাবিহ্বল মুখে আতঙ্কের গাঢ় ছায়া, সেই নারী সুখেনের মা। বাবার দৃষ্টির সোজাসুজি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুখেন। তার পাশে আরেক প্রৌঢ়া নারী ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার আশঙ্কায় সুখেনকে শান্ত করে ঘরে পাঠাতে চাইছে। সুখেন জানে, কিছু কিছু মানুষের ঔদ্ধত্য আর অমানবিকতা এমনি করেই যুগে যুগে প্রশ্রয় আদায় করে এসেছে। মা-জেঠিমা, যা সত্য বলে জানে, শুধু ভয়ের কাছে তা জলাঞ্জলি দিতে দিতে ইচ্ছাহীন একটা মন তৈরি করে ফেলেছে। পদ্মপিসির সঙ্গে মা-জেঠিমাদেব কতটুকু তফাৎ। ওরা তিনজনেই তো এই বাড়ির মেজকর্তা কিংবা বড়কর্তার ইচ্ছার অধীন। তার মনে হল, যে মানুষ প্রতিবাদ করতে জানেনা সে মানুষ হিসাবে সম্পূর্ণ নয়। নিজের দরজার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠিক বাবার মতোই চড়া গলায় সুখেন চিৎকার করে ডাকল,

'হরিকাকা, একটা মানুষকে বিপদের দিনে তাড়িয়ে দেবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন ? তুমি এক পা বাইরে যাবে না।'

হরিকাকার বিপদটা সুখেন বুঝতে পারছে। দোতলার ওপরে মেজকর্তা, একতলার বারান্দায় ছোটবাবু। সে কোন দিকে যাবে। হরিকাকার চোখ দোতলার বারান্দার দিকে উঠে গেল। বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হরিকাকা দরজার দিকে এগোল। সুখেন ততক্ষণে বারান্দা থেকে নেমে এসেছে দরজার কাছে। হরিকাকা দরজা পেরোতে পারছে না। ওপর থেকে বাবার গর্জন শুনেই হরিকাকা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'দরজাটা ছেড়ে দেন ছোটবাবু। আমারে বিপদে ফ্যালবেন না।'

সুখেন হরিকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি চাও এই অবস্থায় পদ্মপিসি রাস্তায় নামুক।'

হরিকাকা হঠাৎ কেঁদে ফেলে বলল, 'আমি কিছু জানিনা ছোটবাবু। আমরা ছোটনোক, চাকর-বাকর। বাবুদের কথায় আমাদের থাকতে নেই।'

সুখেন নিজের মনেই হেসে উঠে মনে মনে বলল, 'যাক, বাবা-জ্যাঠারা যাকে ঘরের ছেলে বলে লোকের কাছে বড়াই করে, মা-জেঠিমাদের কাছে যে নাকি পরিবারেরই একজন, সেই একজন অন্তত নিজে বুঝতে পেরেছে সে এ বাড়ির আসলে কেউ নয়। সুখেন দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল। হরিকাকার সাধ্য ছিল না সুখেনকে সেখান থেকে সরায়। জেঠিমা বারান্দা থেকে নেমে এসেছিল সুখেনকে সরাতে। দোতলা থেকে ভর্ৎসনার সুরে মা বলল, 'খোকা, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।'

জেঠিমার দু'চোখে জল। সুখেনকে টানতে টানতে অনুনয়ের গলায় বলল, 'মেনে নে খোকা, বড়দের কথা মেনে নে।'

সমস্যাটা এত সহজে মেটবার ছিল না। সুখেনই মিটতে দিতো না। তার মাথার মধ্যে একলক্ষ ভীমরুল বোঁ-বোঁ শব্দে গর্জন করে চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে জেঠিমাকে জোর করেই সরিয়ে দিত। সেটাই করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে কিছুই করতে হল না। পদ্মপিসি তার শীর্ণ টিনের স্যুটকেশ নিয়ে নিজেই ম্লানমুখে এসে দাঁড়াল দরজায়। ওপরে হাত তুলে সম্ভবত বাবা আর মা'কে প্রণাম করল। জেঠিমার দিকে তাকিয়ে ছলছল গলায় বলল, 'যাই বড়মা।'

সুখেন অবাক হয়ে দেখল, পদ্মপিসি, যাকে নিয়ে এখনই একটা চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল সে নিজেই সেই নাটকের যবনিকা টেনে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজা ডিঙোবার আগে সুখেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বড়দের

কথা শুনতে হয় ছোটবাবু।'

পদ্মপিসি নিঃশব্দে চলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে শেষ কার্তিকের হিমেল হাওয়া এসে লাগল সুখেনের মুখে-মাথায়। সুখেন পরাজিতের মতো নিজের ঘরে ফিরে যেতে যেতে সেদিন ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত পদ্মপিসিই তাকে হারিয়ে দিয়ে চলে গেল। ওর শেষ কথাটায় কি কোন শ্লেষ ছিল? সুখেনের প্রতি কোন কটাক্ষ? নাকি মা-জেঠিমারা যা বলেন সেই কথাটাই বলে গেল পদ্মপিসি। পদ্মপিসিরা এমনই হয়। হারাবার কিছু নেই, পাওয়ার দিকটাও শূন্য তবুও ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারে না। রক্তের মধ্যে আজন্ম থেকে যায় সেই ভয় যা তাকে কোনদিন মাথা তুলতে দেয় না।

এই ঘটনার পর থেকেই বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। সারাদিনে অথবা রাত্রে বার দুই বাবার মুখোমুখি পড়ে যেত সুখেন। বাবা নিজে থেকে কিছু বলতো না, সেটাই ছিল তার স্বভাব। সেই স্বভাব সুখেনও পেয়েছিল। কিন্তু সুখেন জানে, তাকে নিয়ে প্রায়ই কথা হতো মা আর বাবার মধ্যে। কথা যা বলবার সেটা বাবাই বলতেন। রোজই নানারকম অভিযোগ এনে মাকে শোনাতো এবং মা যে কতবড় কুসন্তান গর্ভে ধারণ করেছে সে কথাটা বুঝিয়ে দিত। এসব কথায় সুখেনের নতুন করে দুঃখ পাওয়ার কিছু ছিল না। দুঃখ পেতো মা। মাকে সব কিছু বোঝানো যেত না। মা বুঝতে চাইতো না। মা-জেঠিমারা হচ্ছে সেই জাতের নারী যারা স্বামীর সব পাপকে আঁচল দিয়ে আড়াল করেও নিজেদের পতিব্রতা রাখতে চায়। স্বামীকে দেবতার আসনে বসানোর চতুর শিক্ষাটা একদা পুরুষরাই দিতে আরম্ভ করেছিল। অথচ এই স্বার্থপর দেবতার দল স্ত্রীকে কখনো দেবী মনে করেনি, শুধু সন্তানধারণের একটি রক্তমাংসের যন্ত্র হিসাবে দেখেছে। সারাদিনে তার ভূমিকা দাসী আর রাঁধুনীর, স্বামী আর তার আত্মীয় পরিজনদের সর্বতঃ সেবায় সেবাদাসী এবং রাত্রে স্বামী দেবতার জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর উপাদান। হঠাৎ-হঠাৎ সুখেনের মনে পড়ে যায় সেইসব রাত্রের কথা-। একটা দেয়ালের ওপাশেই সুখেন শুয়ে আছে। আর ওপাশে বিশালখাটে বাবা আর মা। জ্বরে গা জ্বলে যাচ্ছিল সুখেনের। ডাক্তার বলে গেছেন জ্বর বেশি বাড়লে মাথায় জল ঢালতে হবে। কপালে জলপটি দিচ্ছিল মা। সুখেনের চোখে ফিকে তন্দ্রা। সেই তন্দ্রার মধ্যেই সে শুনতে পেল বাবা বলছে, 'জ্বর কত?'

মা উত্তর দিল, 'একশো দুই। এখন বোধহয় একটু কমেছে।'

বাবা বলল, 'খোকা তো ঘুমিয়েছে। তুমি চলে এসো।'

মা কখনও প্রতিবাদ করতে শেখেনি। এবাড়িতে কোন বৌ সেই শিক্ষা পায়নি। সেটাই নাকি বাড়ির শৃঙ্খলা। বড় বিচিত্র শৃঙ্খলা। পুরুষরা অন্যায় করতে পারবে কিন্তু তাদের বৌরা সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে। মা আমতা-আমতা করে বলল, 'আজ রাতে আমি খোকার কাছে থাকি। রাত্রে যদি জ্বর বাড়ে।'

বাবার গলায় চাপা ভর্ৎসনা। বাবা বলল, 'সে দেখা যাবে। এখন এসো।' মাকে চলে যেতে হয়েছিল।

তন্দ্রাটা ভেঙ্গে যাওয়ার পর সুখেন দেখল নিজের ঘরে বিছানায় সে একা। তার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ নয়। বোধহয় বাইরে থেকে টেনে দেওয়া হয়েছে। শরীরের কষ্টের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেল একটা দুর্বোধ্য অভিমান। তার গলার কাছে আটকে রইল একটা কষ্ট। চোখের জলে বালিশ ভিজে যেতে থাকল। পাশের ঘরে ওরা কেউই বোধহয় ঘুমোয়নি। খানিকবাদে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। তারও কিছু পরে মা এসে কপালে হাত রাখল। মায়ের হাত ঠাণ্ডা। অন্ধকারে নাক টেনে গন্ধ নিতে গিয়ে সুখেন টের পেয়েছিল মায়ের হাতে শুধু জলের গন্ধ নয়, মা'র গাল আর গলা থেকে আসছে চুরুটের গন্ধ।

এখন একটা অচেনা বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকা সুখেন ভেবে দেখল, তার বাবা কিংবা জ্যাঠাদের এখন পর্যন্ত গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। বাবা যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। ক্ষমতার দৌড়ে বরং আরও অনেকটা এগিয়ে গেছে। কোর্টে যখন তার বিচার চলছিল তখনই সে জেনেছিল এবার নাকি বাবা বিধানসভার জন্য টিকিট পাবে। বলা যায়না, হয়তো মন্ত্রী-টন্ত্রীও হয়ে যেতে পারে। বাবা লোক পাঠিয়ে তার জামিনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল কিন্তু সুখেন রাজী হয়নি। সে জানে, কেবলমাত্র তাকে বেকসুর খালাস করে আনার ক্ষমতা বাবার ছিল। ছেলের জন্য সে চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সুখেন সব বানচাল করে দিয়েছে। বাবার পাঠানো উকিলকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আমার মতো বহু নিরপরাধ মানুষ জেল খাটছে। তাদের কাউকে-কাউকে জেলে যেতে হয়েছে বাবাদের জন্যই। তাদের জন্য বাবা কি কোনদিন উকিল পাঠাবার কথা ভেবেছে? আমি যা করব সেটা নিজে-নিজেই করতে চাই।'

দু'দিন ঘুরে উকিল ফিরে গেছে। সুখেন জানে, তাকে নিয়ে চূড়ান্ত অশান্তি হচ্ছে তাদের বাড়িতে। অতিবড় বংশের মুখে চুন এবং কালি দুটোই যথেষ্ট পরিমাণে লেপে দিয়েছে সুখেন। নিজের ভেতরে তার যতই জ্বালা আর যন্ত্রণা

থাক, সে যে বাবা-জ্যাঠাদের বিশ্রিরকম বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে তাতেই তার এক ধরনের সুখ হচ্ছিল।

এখন ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখটায় বন্ধ দরজার গায়ে কান পেতে সুখেন যেন দেখতে পেল, খবরের কাগজে কোন একটা পাতার দিকে চোখ রেখে বাবা ভয়ঙ্কর বিব্রত হয়ে পড়ছে। অবশ্য সে জানেনা, তার খবরটা আদৌ কোন কাগজে বেরিয়েছে কিনা। যদি বেরিয়ে থাকে তাহলে আজকের কাগজেই হয়তো বেরিয়েছে। এই মেয়েটি কি কাগজ রাখে ? কাগজ রাখলেই হবে না, কাগজ পড়ে কি ?

সুখেন টের পেল তার সামনের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। যেন খুব সন্তর্পনে দরজাটা খুলছে মেয়েটি।

॥ ৩ ॥

দরজা খুলে দিয়ে মেয়েটি সরে দাঁড়াল, সুখেন সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলো না। সে দেখল মেয়েটি কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি এখন যে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তাতে হয়তো ভয় নেই, হয়তো অন্যরকম কিছু একটা আছে। সেই অন্যরকমটা যে কী সেটা সুখেন বুঝতে পারল না। একটু আগে পুলিশের কাছে মিথ্যা বলে যে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে আর কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাস করা যেতে পারে সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে সুখেন ঘরে পা দিল।

মেয়েটি ঘরের বড় বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে অন্য একটা বাতি জ্বালল। এই বাতিটায় আলো অপেক্ষাকৃত কম এবং আলোটার চরিত্র একটু রহস্যময়। আলো বদলের দরকার কেন হল সেটা জিজ্ঞেস করতে যাবার আগেই মেয়েটি নিজে থেকেই বলল, 'খুব চড়া আলো আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আপনার পক্ষে নিরাপদও নয়।'

সুখেন ভ্রু কুঁচকে দৃষ্টিটাকে তীরের মতো করে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি সরে গিয়ে জানালার ভারী পর্দাটা টেনে দিতে দিতে বলল, 'পুলিশের জিপটা এখনও বাড়ির আশে-পাশেই আছে। ওদের ধারণা আপনি এই বাড়িরই কোন ফ্ল্যাটে আছেন। অতএব, জানালার দিকে নজর রাখা স্বাভাবিক।'

সুখেন মনে মনে খুশি হলো। অভ্যাসবশত তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'ধন্যবাদ।' মেয়েটি এবার কৌতুক মাখা দৃষ্টিতে সুখেনকে দেখে নিয়ে বলল, 'কিন্তু আর কতক্ষণ আপনি থাকবেন। আর একটু পরেই এই ফ্ল্যাটে লোকজন আসবে। আপনাকে লুকিয়ে রাখা মুশকিল হবে।'

সমস্যাটা সুখেন বুঝতে পারল। কিন্তু তার সমস্যা আরও কঠিন। এখনও বাইরে বেরুনো তার পক্ষে নিরাপদ নয়। মেয়েটি নিজেই তো বলেছে বাড়িটার আশেপাশে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। সুখেন সোফার ওপর বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু বসল না। মেয়েটির দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি নিজেই তো বুঝতে পারছেন এখন এখান থেকে বেরুনো আমার পক্ষে কত মারাত্মক হতে পারে।'

এতক্ষণ পর এই প্রথম মেয়েটি গলায় ঝাঁঝ ফুটিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনার এখানে থাকাটা আমার পক্ষে আরও বেশি মারাত্মক হয়ে উঠবে খানিক পরে।'

সুখেনের মনে হল মেয়েটা হয়তো মিথ্যে বলছে না। হয়তো ওব স্বামী কিংবা আত্মীয়-বন্ধু যাঁদের আসবার কথা তাঁরা এই ফ্ল্যাটে সুখেনকে দেখে খুশি হবে না। মেয়েটি সত্যি কথা বললে ওরাই সুখেনকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করবে। আর যদি মিথ্যে করে বানিয়ে কিছু বলে, কিন্তু তাই বা সুখেনের জন্য মেয়েটি বলতে যাবে কেন? একজন অপরিচিত আগন্তুক, যার পেছনে পুলিশ ঘুরছে তার জন্যে কোন মেয়েই তার স্বামী আব তার আত্মীয়দের কাছে মিথ্যে বলতে যাবে না।

সুখেন নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে বলল, 'আমাকে নিয়ে আপনার সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার সমস্যাটা খুব জটিল। আমাকে আপাতত এখানেই থাকতে হবে।'

মেয়েটি এবার সোফার ওপর বসে পড়ে বিরক্ত গলায বলল, 'আপনি বেছে বেছে আমার ফ্ল্যাটটাতেই এসে উঠলেন কেন? ঠিক এর নিচের ফ্ল্যাটেই মিসেস খাস্তগীর থাকেন। বুড়িটা গোটা ফ্ল্যাটে একা থাকে। আপনি তো সেখানেও যেতে পারতেন।'

সুখেন বুঝতে পারল মেয়েটি তাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে। কিন্তু তাই বলে যদি আস্তে আস্তে মেজাজ দেখাতে থাকে তাহলে হয়তো দরজা খুলে চিৎকার করে কাউকে ডাকতেও পারে। যদি এখন এই ফ্ল্যাট থেকে সুখেন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাহলে পুলিশের ছোঁয়া মেয়েটির গায়েও লাগবে। অন্তত সুখেন ইচ্ছে করলেই মেয়েটিকে জড়িয়ে ফেলতে পারবে। মেয়েটিকে কি সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটু ভয় পাইয়ে দেবে? নাকি···

সুখেন একটু দ্বিধার মধ্যে আটকে গেল। সত্যি বুঝে উঠতে পারছে না সে কী করবে। এখানে আরও কিছুক্ষণ থেকে যাওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোন রাস্তা নেই। অথচ সেটা মেয়েটির পক্ষে নাকি আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে। সুখেন ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বলল, 'যখন আপনার ঘরে এসেছিলাম তখন

বাছাবাছির সময় ছিল না। শখ করে আসিনি সেটা তো বুঝতে পারছেন।'

মেয়েটি এবার চটপট বলে উঠল, 'এবার তাহলে নিচের কোন ফ্ল্যাটে যান।'

সুখেন অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'কী করে যাব।'

মেয়েটির জিভের ডগায় যেন সমাধান তৈরিই ছিল। সে বলল, 'এখানে যেমন করে এসেছেন, তেমন করেই যাবেন।'

সুখেন এবার ইচ্ছে করেই কঠোর চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল। কণ্ঠস্বর রুক্ষ করে বলল, 'বড্ড বাজে কথা বলছেন। সব জায়গা, সব পরিবেশ আমার পক্ষে মানানসই নাও হতে পারে।'

মেয়েটি এবার অসহায় গলায় বলল, 'তাহলে ?'

সুখেন জানে তার বিপদ বাড়ছে। বাড়ছে বোধহয় মেয়েটিরও দুঃশ্চিন্তা। তবুও তাকে বেপরোয়া হতে হল। সেই ভঙ্গিতেই বলতে হল, 'সে সব আমি জানি না। আপনি ভাবুন। আমি একটা মিথ্যা খুনের মামলার আসামী। আমি জেল থেকে পালিয়েছি। দরকার হলে একটা সত্যিকারের খুন করতে আমার আটকাবে না।'

মেয়েটির চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সোফায় বসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে সুখেনের দিকে তাকাল। দৃষ্টিটা এমনই যা সুখেনকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। নিজেকে সহজ করার তাগিদে সে সিগারেটের প্যাকেট থেকে নিজেই একটা সিগারেট তুলে ধরাল।

মেয়েটি ওই অদ্ভুত দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতো কিংবা কী করতো সে কথা সুখেন জানে না। সে নিজেকে মেয়েটির দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে নেবার জন্য সিগারেট টানতে টানতে ওব শোবার ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল আর ঠিক তখনই সর্বনাশা এক আবহসঙ্গীতের মতো বেজে উঠল দরজার বেলটা। মেয়েটি চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়িটা দেখল। ইশারায় সুখেনকে শোবার ঘরে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

শোবাব ঘর থেকে দরজা দেখার কোন উপায় নেই। সুখেন উৎকর্ণ হয়ে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সুখেন জানে, তার চারপাশে ডালপালা মেলে ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিপদ। যেন প্রাচীন কোন বটবৃক্ষের মতো তার শরীরের চারপাশে কেবল ভয়, উৎকণ্ঠা আর যন্ত্রণাজাগর প্রতীক্ষার ঝুরি নেমে এসেছে। তারা মাটি থেকে ক্রমাগত বয়ে আনছে বিপদের নতুন নতুন সম্ভাবনা। মেয়েটির স্বামী কিংবা যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা কি এসে গেলেন ? মেয়েটির দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর আর কোন শব্দ নেই।

শোবার খাটের কাছে, ঠিক মাথার দিকটায় একটা টেবিল ঘড়ি। সেই ঘড়িটার টিকটিক শব্দ এখন এই ঘরের মধ্যে এমনভাবে বেজে যাচ্ছে যেন প্রত্যেকটা শব্দ এক একটা তীব্র হাতুড়ির ঘায়ের মতো সুখেনের হৃৎপিণ্ডে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। সুখেন বুঝতে পারছে না কে বা কারা এসেছে। ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে মৃদু এবং অস্পষ্ট কয়েকটি শব্দ তার কানে এলো যা থেকে কিছু বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। সামান্য সময় পরেই মেয়েটিকে বলতে শোনা গেল, 'না, দরকার নেই। আমিই করে নেব।'

এরপর শব্দহীন আবার কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। যেন অনন্ত সময় খুবই মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। সুখেনের পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। জিভটা এখন তেতো আর বিস্বাদ। ঘরে ঢুকে সিগারেট নিভিয়ে দিয়েছিল। নিভে যাওয়া সিগারেটটা পায়ের কাছে পড়ে। সুখেন আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করার শব্দ পেল। যে এসেছিল সে চলে গেছে কিংবা থেকে গেছে ঘরের মধ্যে সেটা সুখেন বুঝতে পারছে না। সুখেন অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট তিনেক বাদে ঘরে এলো মেয়েটি। সুখেনের পায়ের দিকে নজর যেতেই সে নিচু হয়ে পোড়া সিগারেটটা তুলে নিল। মেয়েটির বাঁ হাতের দুই আঙুলের মধ্যে চিমটি দিয়ে ধরা পোড়া সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে সুখেন বলল, 'উপায় ছিল না, তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলতে হয়েছে।'

মেয়েটি ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলল, 'ঘরে কেউ নেই।'

সুখেন বসবার ঘরে এলো। টেবিলের ওপর ঢাউস সাইজের একটা হট টিফিন কেরিয়ার। তাহলে যে এসেছিল সে বুঝি এইটি দিয়ে গেল। মেয়েটি কি হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খায়? অতবড় টিফিন বাক্সে কতজনের খাবার থাকে? খাবারের কথা মনে আসতেই সুখেনের বোধে ক্ষুধাটা জেগে উঠল। কাল রাতের পর থেকে বস্তুত সে কিছুই খায়নি। খিদে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মেয়েটির কাছে খাবার আশা করা নিতান্ত মাত্রাছাড়া চিন্তা। মেয়েটি যখন তাকে পুলিশের কাছে আড়াল দিয়ে নিরাপদ করতে চেয়েছে, মিথ্যে বলেছে তখন সে অবাক হয়েছিল। কিন্তু তার থেকেও বেশি অবাক হল এখন। মেয়েটি এবার আদেশের গলায় বলল, 'যান, বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসুন।'

সুখেন প্রশ্ন করল, 'কেন?'

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে সুখেনের দিকে তাকাল। তার নাক ফুলে ফুলে উঠল। ঘরের রহস্যময় মায়াবী আলো মেয়েটির নাকছাবিটায় একবার ঝিলিক দিয়ে গেল। মেয়েটি বলল, 'ভয় নেই, বাথরুমে বন্দী করে ধরিয়ে দেব না।'

সুখেন বেসিনে এসে প্রথমে হাত ধুলো, তারপর মুখ। চোখে জল লাগাতেই

চোখটা জ্বালা করে উঠল। তার মনে হল এই ঠাণ্ডা জলে এখন স্নান করতে পারলে তার শরীর জুড়িয়ে যেত। মুখ-হাত ধুয়ে সুখেন ঘরে এসে দেখল হট টিফিন কেরিয়ারটি ততক্ষণে মেয়েটি খুলে ফেলেছে। ঘরের মধ্যে মশলাদার সুস্বাদু খাবারের গন্ধ। মেয়েটি এবার একটা চাবি হাতে নিয়ে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে ছাদে যাবার দরজা খুলল। এখানটাতেই খানিক আগে সুখেনকে লুকিয়ে রেখেছিল মেয়েটি। এবার কী করতে চাইছে ? খানিক আগে যেমন মেয়েটি বুঝতে পারেনি সুখেন কী করতে চায়, এখন সুখেন বুঝতে পারছে না, মেয়েটি তাকে নিয়ে কী করতে যাচ্ছে। সুখেন পেছন পেছন আসছিল। মেয়েটি ছাদে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল, পেছনে মেয়েটিকে অনুসরণ করছে সুখেন। বেশি নয়, মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙেই ছাদে পৌঁছে গেল ওরা। সিঁড়ির মুখেই ডানদিকে ঘরের দরজা। বাঁ দিকে অনেকটা বড় ছাদ। চাবি দিয়ে দরজা খুলল মেয়েটি। ঘরের মধ্যে এসে বলল, 'আপাতত এই ঘরে আপনাকে থাকতে হবে। নিতান্ত দরকার না পড়লে ঘরের আলো জ্বালবেন না। যদি জ্বালেন তা হলে এই আলোটা—"

মেয়েটি অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালল। ছোট মাপের একটা ঘরে একজন মানুষের থাকবার মতো সব আয়োজনই মোটামুটি রয়েছে। একটা ছোট তক্তোপোষ এবং তার ওপর বিছানা পাতা। মাথার দিকে একটা টেবিল। সেই টেবিলের ওপবেই এখন জ্বলছে ঘেরাটোপ দেওয়া একটি টেবিল ল্যাম্প। ল্যাম্পেব আলোটা ছোট্ট একটা বৃত্তের আকারে টেবিলেব ওপর ছড়িয়ে পড়ে ঘরটাকে অংশত আলোকিত করেছে। মেয়েটি এবার হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের আরেকটা সুইচ টিপে ঘরের পাখাটা চালিয়ে দিল।

সুখেন লক্ষ্য করল ঘরের একপাশে আরও একটি দরজা ; যেটি আপাতত বন্ধ। সুখেন হাত তুলে সেই দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা কী ? ওপাশে বুঝি ঘর আছে ?'

মেয়েটি মাথা নাড়তে নাডতে দরজাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে বলল, এটা বাথরুম। ব্যবহার করবার সময় এই ঘরের আলোটা না জ্বালালেও চলবে। টেবিল ল্যাম্পটাতেই মোটামুটি কাজ হয়ে যাবে।'

সুখেন মনে মনে নিশ্চিন্ত হল। না হয়ে তার উপায়ও ছিল না। মেয়েটাকে বোধহয় বিশ্বাস করা চলে। এত কাণ্ডের পর সে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর যদি ওর কোন অন্য মতলব থাকে...

সুখেন মনের দ্বিধাটুকুকে সরিয়ে দিয়ে ভাবল, এখন এইটুকু ঝুঁকি তাকে

নিতেই হবে। সে মেয়েটিকে খুশি করার জন্য বলল, 'থ্যাঙ্কিউ।'

মেয়েটি ঠোঁট চেপে সামান্য একটু হাসল। চলে যেতে যেতে বলল, 'দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখবেন। আমি না ডাকলে খুলবেন না।'

মেয়েটি দরজা পেরিয়ে যেতেই সুখেন বলল, 'এখন তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি।'

মেয়েটি চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে সুখেনকে দেখল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবার আগে বলল, 'এখনই না। আমি আসছি।'

মেয়েটি নেমে গেল ওর ঘরে। সুখেন ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভাবল, অচেনা জায়গায় ভয় দেখিয়ে এর থেকে ভাল আশ্রয় কারো কপালে জোটে না। সুখেন বিছানায় বসল। আস্তে আস্তে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানার ওপর। শুয়ে পড়ার মধ্যে যে এত আরাম সেটা আগে কখনও এমন করে বুঝতে পারেনি। গোটা শরীর ছেয়েছিল ক্লান্তি আর অবসাদে। বিছানার আশ্রয়ে সেই শরীর যেন জুড়িয়ে যেতে থাকল। সুখেন বাঁ হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে অস্ফুটে বলে উঠল, 'আ!'

একটু পরেই ঘরের দরজায় পায়ের শব্দ। সুখেন উঠে বসবার আগেই মেয়েটির গলা পাওয়া গেল।

'এই রইল আপনার খাবার। বাথরুমের বেসিনে খাবার জল পাবেন।'

মেয়েটি টেবিলে খাবার নামাল। দুটো ডিনার প্লেট মুখোমুখি ঢাকা দেওয়া। অর্থাৎ প্লেটের খাদ্যবস্তুটা আরেকটা প্লেট দিয়ে ঢাকা দিয়ে এনেছে। ঘরের মধ্যে একটা মিটসেফ গোছের বস্তু ছিল। তার মধ্যে থেকে কাঁচের গ্লাস এনে মেয়েটি রাখল টেবিলে। বাথরুমের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ভেতরে তোয়ালে, সাবান সবই আছে।'

সুখেন এবার সত্যি সত্যি কৃতজ্ঞ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়েছে। ঢাকা দেওয়া প্লেট থেকে খাবারের গন্ধটা তার নাকে এসে যত লাগছিল, পেটের খিদেটা ততই হামলে উঠছিল সুখেনের মধ্যে। এখানে কয়েক ঘণ্টার আশ্রয় পাওয়াটাই ছিল তার কাছে জরুরী। খাবার কথা সে কল্পনাও করেনি। মেয়েটি এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সুখেনকে বলল, 'এবার দরজা বন্ধ করে রাখবেন।'

সুখেন অনুগতের মতো মাথা নাড়ল। মেয়েটি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়াল। পেছন থেকে সুখেন মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে না মেয়েটি দু হাত বুকের কাছে নিয়ে কী করছে।

মেয়েটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সুখেনের দিকে বাড়িয়ে দিল ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট. সম্ভবত সেই প্যাকেটটাই। প্যাকেটের সঙ্গে একটা লাইটারও।

আশাতীত ব্যাপার ঘটিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। সুখেন হাত বাড়িয়ে দুটো জিনিসই নিয়ে নিল। কারণ সঙ্কোচ করার কোন মানে হয় না। মেয়েটি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, 'দরজা বন্ধ করে দিন। আমি না বললে খুলবেন না।'

সুখেন কৃতজ্ঞ চোখে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। একজন অচেনা-অজানা লোকের জন্য—

সুখেনকে কথা শেষ করতে দিল না মেয়েটি। হাত তুলে সুখেনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু আপনাকে চিনেছি।'

কথাটা বলেই মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল। অন্ধকার বাতাসে রেখে গেল তার গায়ের গন্ধ আর একটি রহস্যময় সংলাপ!

মেয়েটি তাকে চেনে? কেমন করে চেনে? সুখেন তো মনে করতে পারছে না এমন কোন মেয়ের সঙ্গে অতীতে তার কখনও কোথাও দেখা হয়েছিল কিনা। মেয়েদের সঙ্গে কোনকালেই তার তেমন মাখামাখি ছিল না। কলেজে পড়ার সময় একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়ার সুবাদে কিছু মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ ছিল। মাঝে মধ্যে কলেজ ক্যানটিনে কিংবা কফি হাউসে একসঙ্গে বসে কফি খেয়েছে, সময় কাটাবার জন্য আড্ডা দিয়েছে। কিন্তু সেটাকে ঠিক ঘনিষ্ঠতা বলা যায় না। সে কখনই কোন মেয়ের সঙ্গে একা কোথাও বসে গল্প করেনি। নিজের পাড়াতেও কোন মেয়ের সঙ্গে তার তেমন পরিচয় ছিল না যা সহজেই মনে করতে পারা যায়। মেয়েটি যদি সত্যি বলে থাকে তাহলে সুখেনের জানতে ইচ্ছে করছে মেয়েটি তাকে প্রথম কখন চিনল। যখন তাকে প্রথম দেখল না যখন সে তার হাত দিয়ে মেয়েটির মুখ চেপে ধরেছিল। নাকি আরও পরে। তবে কি ভয় পেয়ে বাধ্য হয়ে মেয়েটি তাকে আশ্রয় দেয়নি। আশ্রয় দিয়েছে চেনা লোক বলে। তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। মেয়েটি সম্পর্কে সুখেনের মধ্যে আর কোন অপরাধবোধ থাকার কথা নয়। বরং ভয় নয়, মেয়েটি করুণা করে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সে যাই হোক, কীভাবে এবং কেন সে আশ্রয় পেয়েছে তার বিশ্লেষণটা তার কাছে জরুরী ছিল না। আশ্রয় পাওয়াটাই জরুরী। আপাতত সেটি সে পেয়ে গেছে। পুলিশের জিপ গাড়ি নিচের রাস্তায় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেও তার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওরা যতক্ষণ নিচে অপেক্ষা করবে সুখেন ততক্ষণ ওপরে বিশ্রাম করে নিতে পারবে।

সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে সুখেন দু হাতে প্লেটের ঢাকনা খুলে দেখল খাবারের আয়োজনটা একেবারে মোগলাই মেজাজের। দুটি নান, মাংসের চাঁপ, মটন টিক্কা জাতীয় একটা বস্তু, পাশে স্যালাড আর কিঞ্চিৎ আচার। ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়ে যায় বলে যিনি রায় দিয়েছিলেন সেই

মহামতি পণ্ডিতমশাই সম্ভবত খিদে বস্তুটার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। খিদের পেটে খাবারের গন্ধ খিদেটাকে প্রবলভাবে খুঁচিয়ে দেয়। পেটের মধ্যে তোলপাড় হতে থাকে। মুখ ভিজে আসতে থাকে লালায়।

সুখেন খেতে বসতে যাবার আগেই হঠাৎ খেয়াল করল ঘরের দরজাটা বন্ধ করা হয়নি। মেয়েটি যাবার আগে এমন একটা কথা বলে গিয়েছিল যে সুখেনের দরজা বন্ধ করার কথা মনে আসেনি। তারপর খাবারের গন্ধ এবং আকর্ষণ তাকে টেনে এনেছে ঘরের মধ্যে। খিদের টানে নিজের বিপদ এবং সতর্কতা সম্পর্কে প্রায় মিনিট দেড়েক সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। সুখেন দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলো খাবারের কাছে। খেতে খেতে তার মনে হল, মেয়েটি কি রোজ রাত্রেই হোটেল থেকে এই রকম খাবার আনিয়ে খায়! পুলিশের কাছে কী একজন মালহোত্রার নাম করেছিল মেয়েটি। মালহোত্রা লোকটির সঙ্গে মেয়েটির কিসের সম্পর্ক? তবে কি মেয়েটি অবাঙালী? খিদের চাপটা যত কমে আসছিল মেয়েটি সম্পর্কে নানা চিন্তা ততই বেড়ে যাচ্ছিল। যাবার আগে যদি ইচ্ছে করে মিথ্যে না বলে থাকে তাহলে সেটাও বেশ জটিল ব্যাপার। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যদি অতীতে একবারও তার আলাপ হয়ে থাকে তাহলে সুখেন নিশ্চয়ই চিনতে পারতো। সে তো এমন বিখ্যাত কোন লোক নয় যে তাকে অনেকে চিনলেও সে অনেককেই চেনে না। বলা যায় না, হয়তো সুখেনকে ধন্দে ফেলবার জন্যে মেয়েটি মিথ্যে কথা বলে চলে গেছে। কিন্তু তাতেই বা মেয়েটির কী লাভ! যদি তাকে চিনেও থাকে তাহলে মেয়েটিরও তো এখন একই রকম ধন্দে পড়ে যাওয়ার কথা।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে সুখেন সিগারেট ধরাল। প্যাকেটটা বিছানা থেকে তুলে নিতেই ঝট করে সেই গন্ধটা তার নাকে লাগল। সুখেন সিগারেটের প্যাকেটটা নাকের কাছে তুলে এনে বুঝল, অন্ধকার ঘরে মেয়েটি বুকের ব্লাউস ফাঁক করে ভেতরে যে গন্ধটা স্প্রে করছিল এখন প্যাকেটের গায়ে সেই গন্ধ। সুখেন লাইটারটার মধ্যেও ক্ষীণভাবে সেই একই গন্ধ আবিষ্কার করে নিশ্চিন্ত হল যে, মেয়েটির দুটি হাত বন্ধ থাকায় সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা নির্ঘাৎ ব্লাউসের ভেতরে করে এনেছিল। সুখেন মনে মনে হাসল। ব্যাপারটা যেন সিনেমার একটি নাটকীয় সিচুয়েশনের মতো। সুন্দরী নায়িকা নায়ককে লুকিয়ে রেখেছে তার ঘরে। তার জন্যে গোপনে বয়ে আনছে খাবার। বুকের মধ্যে করে নিয়ে এসেছে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। এসব নাটকে একজন ভিলেন থাকতে হয়। এখানে সেই ভিলেনটি কে? পুলিশ নাকি তার স্বামী। নাটকটা আরও জমে যাবে যদি একটু পরেই জানা যায় মেয়েটির স্বামীই পুলিশ

অফিসার। সুখেনকে ধরে আদালতে এবং সেখান থেকে জেলে পাঠাবার দায়িত্বটা তারই ওপর বর্তেছে।

সুখেন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। জানালার বাইরে অন্ধকার আকাশ। দূরে দূরে কয়েকটা বড় বাড়ির মাথায় লাল আলো দেখা যাচ্ছে। সুখেন আস্তে আস্তে দরজা খুলে খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটা পুরো খুলল না। মাত্র আধখানা। সামনে অন্ধকারে ছমছমে ছাদ। ছাদের মাথায় পর পর কয়েকটা অ্যানটেনাকে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। কই মাছের কাঁটার মতো সাদা অ্যানটেনাগুলো পর পর দাঁড়িয়ে। অন্ধকার আকাশে অজস্র তারা। ছাদের ওপর বয়ে যাচ্ছে উতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় ভাসিয়ে আনছে দূর থেকে একটা গানের কলি। বোধহয় কোথাও মাইক বাজছে। গানের বাণীটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, কেবল সুরটা হাওয়ায় ভেসে ভেসে গড়িয়ে যাচ্ছে ছাদের ওপর দিয়ে। বাইরের হাওয়ায় যেন মুক্তির স্বাদ আছে। সুখেন দরজা থেকে বাইরে এলো। কচ্ছপের পিঠের মতো আকাশটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে চারদিকে। ছাদ থেকে কিছু দূরের কয়েকটা নিওন আলোব বিজ্ঞাপনের খণ্ড খণ্ড অংশ দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা কলকাতা বটে, কিন্তু কলকাতাব কোন অঞ্চল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। বাইরের বাতাসটা ভারি ভালো লাগছিল সুখেনের। কিন্তু এই ভালো লাগার জন্য তাকে মূল্য দিতে হতে পারে। তাই সে আস্তে আস্তে ঘরে চলে এলো। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে শ্যাওলার মতো কোমল অন্ধকার। সুখেন চোখ বুজে থাকল। সে বুঝতে পারছে আরামের ছোঁয়া পেয়ে তার শরীর সেই আরামের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে চাইছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল সুখেনের। কিন্তু কোন পলাতক কয়েদির পক্ষে ঘুম নিতান্তই শত্রু। ঘুমকে সুখেনের বিশ্বাস নেই। সে না ঘুমিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে বুঝতে পারে না কখন জেগে ওঠা দরকার।

সুখেন অন্ধকারেই চোখ খুলল। হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে খুঁজে নিল সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা। সিগারেট বার করবার আগে প্যাকেটটাকে নিয়ে এলো নাকের কাছে। মেয়েটির গা থেকে উঠে আসা গন্ধটা রয়ে গেছে প্যাকেটের গায়ে। সুখেনের আটাশ বছরের জীবনে এই প্রথম একটা বিচিত্র অনুভূতি এলো। সে দেখল, একটি মেয়ের গায়ের গন্ধটুকুর মধ্যে দিয়ে মেয়েটার সম্পূর্ণ অবয়ব তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সিগারেট বার করতে করতে সে ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মেয়েটি কি ভেতরে ভেতরে তাকে আকর্ষণ করছে ? সুখেন বুঝতে পারছে না। তার মনে হল এই

অপরিচিতার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম বলেই মেয়েটি বার-বার তার ভাবনায় জড়িয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের সম্পর্কে সুখেনের মধ্যে বাড়তি কোন দুর্বলতা নেই। কোনরকম শরীরী আকর্ষণও সে তেমনভাবে কখনও বোধ করেনি। বয়সটা যখন তরতর করে বেড়ে যাচ্ছিল, নাকের নিচে মিহি হয়ে ফুটে উঠছিল গোঁফের আভাস সেই বয়সে শরীরের মধ্যে গোপনে কিছু পরিবর্তন ঘটে যেতে থাকে। তখনকার সেই দুর্বোধ্য উন্মাদনার কথা আলাদা। সেটা ভেতর থেকেই ঘটতে থাকে। সুখেন সেই বয়সটা পেরিয়ে এসেছে অনেককাল আগে। এখন, ঠিক এই মুহূর্তে সেই বয়সের স্বভাব ফিরে আসার কথা নয়। তাছাড়া, এটা সেই সময়ও নয় যে একজন মেয়েকে নিয়ে ভাবাভাবি করা যায়। আজ যে কোন সময়েই তাকে এই আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। খুঁজতে হবে অধিকতর কোন নিরাপদ আস্তানা। বাকী জীবনে এখানে ফিরে আসা অথবা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। হয়তো তার স্মৃতিতে থেকে যাবে এই মেয়েটির মুখ, তার সুসজ্জিত ফ্ল্যাট. ছাদের ঘরের গোপন আশ্রয়। হয়তো এই গন্ধটাও।

ঘরের দরজা এবং দুটো জানালাই বিলকুল বন্ধ থাকায় ঘরের মধ্যে থেকে সিগারেটের ধোঁয়া দ্রুত সরে যেতে পারছিল না। সুখেন অন্ধকারেই উঠে বসে একটা জানালার একদিকের পাল্লা খানিকটা ফাঁক করে রাখল। সেই ফাঁক দিয়ে বাইরের হাওয়া আসছিল। সুখেন এবার অনুমানে বুঝল বাড়িটা নিশ্চয়ই সাত কিংবা আট তলা। হয়তো বা তার চাইতেও বেশি। বেশি উঁচুতে বলেই ছাদে অমন হাওয়া বইছিল। দুটো জানালা হাট করে খুলে রাখলে ঘরে পাখা চালাবার দরকার হয় না। কিন্তু অতখানি উন্মুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা এখন সুখেনের নেই।

সিগারেটের আগুন নিভিয়ে ফেলে সুখেন আবার চোখ বুজল। সে বুঝতে পারছে তার চোখের ভেতর এখন আঠার মতো লেগে আছে ঘুম। বড় লোভনীয় জিনিস। কিন্তু ঘুমের মধ্যে বিপদ থাকতে পারে ভেবে সে জেগে থাকবার প্রবল তাড়নায় আবার বিছানার ওপর উঠে বসল। ছাদের এই ঘর থেকে বোঝবার উপায় নেই গোটা ফ্ল্যাটবাড়ির কোথাও কেউ জেগে অথবা ঘুমিয়ে আছে কিনা। এখন ঘড়িতে সময় কত সেটাও সুখেন জানে না। সন্ধ্যে হবার মুখে মুখে সে কলকাতায় এসেছিল এই কথাটা তার মনে আছে। তারপর থেকে সময়ের হিসেব রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেয়েটির শোবার ঘরের টেবিল ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সময়টা দেখেনি। বাইরে রাত থাকতে থাকতেই তাকে চলে যেতে হবে। দিনের বেলা এখান থেকে বেরুনো যাবে না। তার পোশাকটার চেহারা এমনই ক্লিন্ন যে সবার চোখেই দৃষ্টিকটু লাগবে। পোশাকটা বদলাতে পারলে ভালো হতো। অর্থাৎ নিজের চেহারায় এবং

পোশাকে একটু পরিবর্তন আনাটা এখন তার পক্ষে জরুরী। যদিও তেমন কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও সুখেন মনে মনে ভাবতে লাগল চেহারাটা যদি পোশাক দিয়ে বদলে ফেলা যেত তাহলে তার পক্ষে এখান থেকে অন্যত্র কোথাও সরে পড়া অনেক সহজ হয়ে উঠতো।

কিন্তু এখান থেকে সে কোথায় যাবে ? প্রশ্নটা বাঘনখে তার বুকের মধ্যে আঁচড় কাটল। সে নিজের ইচ্ছায় এখানে আসেনি। পুলিশের তাড়া কিংবা ভয় তাকে এখানে তাড়িয়ে এনেছে। কিন্তু এখান থেকে সে কোথায় যাবে ? বারাসাতে নিজেব বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্ন আর নেই। সেখানে পা দেওয়া মাত্র সবাই জেনে যাবে খুনে ছেলেটা আবার ফিরে এসেছে। বারাসাতে নিজের বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকা কঠিন। পিতৃদেবের মনোভাব নিশ্চয়ই আরও কঠোর হয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। ছেলের কীর্তি তাঁর ঝকঝকে পলিটিক্যাল কেরিয়ারে বিষম দাগা দিয়েছে। সুখেন জানে, তার পিতৃদেব অতিশয় ঘোড়েল, অচিরেই সেই দাগা সে মেরামত করে ফেলবে। হয়তো এই কয়েকদিনে সেটা সে করেও ফেলেছে। সুখেনের কখনও কখনও মনে হয় বাবা যদি অভিনয়ের লাইনে যেতো তাহলে আরও বেশি নাম করতে পারতো। বাবা রোজ সকালে উঠে ছাদে গিয়ে মুগুর ভাঁজে। তারপর স্নান সেরে ঠাকুরঘরে গিয়ে আধঘণ্টা গীতা পাঠ করে। গীতা পাঠের ফলটা চমৎকার টের পাওয়া যায় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মিটিংয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে এবং বাড়িতে অনুগ্রহ প্রার্থীদের সামনে বাবার মতো এমন সাবলীলগতিতে মিথ্যে কথা বলা আব মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষমতা খুব বেশি লোকের নেই। এই বিরল গুণের জন্যই বাবা তিন-তিনবার স্কুল মাস্টার হরিপদ বিশ্বাসকে হারিয়ে ইলেকশনে জিতে চেয়ারম্যান হয়ে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই একটু বেলা করে ঘুম থেকে ওঠেন। তিনি আবার প্রাণায়ামে বিশ্বাসী। নিজের পাড়া এবং বেপাড়ার গণ্ডা পাঁচেক হরিকীর্তনের আখড়ার তিনি আমরণ প্রেসিডেন্ট। বারাসাত কোর্টে তার জম-জমাট পসার। মক্কেলরা মামলা হারে আর জ্যাঠামশাই একখণ্ড করে জমি কেনেন। জ্যাঠামশাই বড় জমিজমা ভালোবাসেন। রক্তে পুরনো জমিদারীর নেশাটা থেকে গেছে এখনও। রাত্রে বাড়ি ফিরে দুই ভাই মুখোমুখি বসে ফিসফাস কথাবার্তা বলে। হরিকাকা তখন মাছ ভাজা আর বাদাম নিয়ে ঘনঘন তাদের ঘরে যায়। মফস্বল শহরের কাক এবং পক্ষী কেউই টের পায় না তখন ঘরে কী হয়।

এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সুখেনের মাথা ব্যথা ছিল না। সে জানতো তার বাপ-জ্যাঠার যথেষ্ট টাকা আছে এবং মানুষকে ভয় দেখাবার মতো ক্ষমতা ও

প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। কাউকে তোয়াক্কা না করেও সুখেনের দিন চলে যেতে পারত।

কিন্তু তেমনভাবে দিন গেল না। দাবার ছকের মতো সাজানো জীবনটা একেবারে উল্টোপাল্টা করে ফেলল সুখেন। কিন্তু সুখেন কি ঠিক এরকমই হতে চেয়েছিল ?

সুখেন কী হতে চেয়েছিল সেটা সুখেন নিজেও জানে না। বাবা-জ্যাঠাদের মতো হতে চায়নি। সে প্রবল আক্রোশে অন্যরকম হতে চেয়েছিল। অথচ কেমন সে হতে চায়, কার মতো হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তার বুকের ভেতরে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠেছিল একটা অদৃশ্য অগ্নিকুণ্ড। সেই আগুনেব জ্বালায় সে পুড়ে যাচ্ছিল, ঝলসে যাচ্ছিল তার বোধ আর বুদ্ধি। কখনও কখনও তার এমনও মনে হতো তার মাথার মধ্যে শনশন করে বয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া। তখন তার ইচ্ছে হতো হাতের সামনে যা কিছু আছে তাই সে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দেয়। জ্যাঠামশাইয়ের আইন বইয়ের আলমাবি, সিন্দুক, বাবাব মিউনিসিপ্যালিটি অফিস ঘর, মা'র নামে বাবার চিটফান্ডের ব্যবসা, জ্যাঠামশাইয়ের সাধের বাগান বাড়ি, তার কীর্তনের আখড়া সব-সব কিছু সে এলোমেলো করে দিতে চায়।

যদি তাই কবতে পারতো তাহলে সুখেনের মধ্যে হয়তো এক ধরনের শান্তি আসতো। সেটা সে পারেনি বলেই তাব বুকের মধ্যে ক্রমাগত অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে থাকে। সেই জ্বালার উপশম কিসে এবং কোথায সেটা সুখেন জানতো না।

সুখেনের মাথার শিবা দপদপ করে উঠল। তার মধ্যে অস্বস্তিকর একটা উত্তেজনা। সুখেন বিছানার ওপর উঠে বসল। নাকের ডগায় ঘাম জমেছে বোধ হওয়ায় সে বাঁ হাত দিয়ে নাকটা মুছল। ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে। আলো না জ্বালিয়েও এখন সে বাথরুমে গিয়ে বেসিনের কাছ থেকে খাবার জল নিয়ে আসতে পারবে। সুখেন আলো জ্বালাল না। অন্ধকারেই গেলাসে জল ভরে নিয়ে এসে লাইটার জ্বেলে গেলাসের জলটা দেখে নিল। তেষ্টা পেয়েছিল। জল খেতে খেতে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে চোখ রেখে সে বুঝতে চাইল, এখন ক'টা বেজেছে ? বাইরে অন্ধকারে রাতের সঠিক বয়স বোঝা যায় না। অন্তত সুখেন বুঝতে পারল না। বিছানার কাছে সরে আসতে আসতে সে ভাবল, আজ রাতে মেয়েটি নিশ্চয়ই আর ছাদে আসবে না। হয়তো ভোররাত্রে স্বামীর ঘুম ভাঙার আগে এসে তাকে ডেকে নেবে অথবা স্বামী অফিস চলে যাবার পর। মেয়েটি কি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে ? বিছানায় গিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে এখনই ঘুমিয়ে পড়ার জন্য মেয়েটি এতক্ষণ ধরে সাজেনি। হয়তো এখনও তার ঘরে

স্বামীর বন্ধু অথবা আত্মীয়রা আছেন। আজ ওদের ঘরে কি কোন উৎসব ? কে জানে, হয়তো আজই ওদের বিবাহবার্ষিকী।

॥ ৪ ॥

চমকে ওঠার মতো অভাবিত একটা দৃশ্য। টেবিল ল্যাম্পের বৃত্তাকার আলোর ভগ্নাংশ দরজার মুখে, দরজার ওপারে বিশাল ছাদ জুড়ে ফ্যাকাশে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বয়ে যাচ্ছে চপল বাতাস, নিপুণ নৈঃশব্দে স্থির হয়ে আছে কলকাতার রাত। এই রকম একটা দৃশ্যপটে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি।

নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যবর্তী একটা স্তর আছে। সুখেন জানে না, সেটাকেই তন্দ্রা বলা হয়ে থাকে কিনা। গভীর ঘুমের গহ্বরে ঢুকে গেলে মানুষ অচেতন এবং অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। সুখেন ঠিক সেই অবস্থায় ছিল না। আবার যাকে বলে জেগে থাকা অর্থাৎ, সব কিছু ঠিকঠাক বুঝে ওঠার মতো প্রখর চেতনাও তার মধ্যে কাজ করছিল না। বন্ধ চোখের পাতায় জড়িয়ে ছিল এক ধরনের বিহ্বলতা, শরীর ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল, চেতনা জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল অলস আচ্ছন্নতা। ঠিক সেই রকম অবস্থায় দরজায় শব্দ হতে শুনল। শিথিল শরীর সেই শব্দে তৎক্ষণাৎ উঠে বসেনি, বসতে পারেনি। একটু বিরতি দিয়ে আবার পরপর দুটো শব্দ হতেই সুখেন উঠে বসল। ঘরের বাতি জ্বালবার আগে দরজার কাছে এসে ভেতর থেকে চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কে' ?

বাইরে থেকে নারী কণ্ঠে উত্তর এল, 'ভয় নেই। আমি।'

সুখেন টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে দরজা খুলল এবং খুলেই চমকে উঠে দেখল মেয়েটি তার সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটিকে দেখে চমকাবার কোন কারণ ছিল না। অস্পষ্ট অন্ধকারে তাকে তেমন স্পষ্ট করে দেখাও যাচ্ছিল না। কেবল বোঝা যাচ্ছিল তার শাড়ির আঁচল হাওয়ার টানে উড়ছে। মেয়েটি ঘরে পা রাখতেই পরিষ্কার আলোতে তাকে দেখে সুখেন যথার্থ চমকালো। একি সেই মেয়ে যাকে খানিক আগেও সে দেখেছে ? নিভাঁজ শয্যায় দেদার হুটোপাটি করলে সেই শয্যার যেমন চেহারা হয় মেয়েটিকে এখন দেখাচ্ছে ঠিক সেই রকম। মেয়েটি দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার মুখ ভর্তি পান, ঠোঁটের কোণ দিয়ে পানের রস গড়াচ্ছে। চোখের দৃষ্টি মেঘলা আকাশের মতো ঘোলাটে। মেয়েটি দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে পিচ করে পানের পিক ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু পিকটা বাইরে গেল না। কিছুটা তার ঠোঁট বেয়ে থুতনীর

কাছে গড়িয়ে এল, বাকিটা পড়ল বুকের ওপর। মেয়েটি বেপরোয়া ভঙ্গিতে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, 'ভয় নেই, পুলিশের জিপ চলে গেছে। এবার আপনিও কেটে পড়তে পারেন।'

মেয়েটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সুখেনের নাক ফুলে উঠল। ঘরের হাওয়া থেকে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বলল, 'আপনি বোধহয় মদ খেয়েছেন?' মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'চুপ! ওসব কথায় দরকার নেই। এবার চলুন আপনাকে নিচে যাবার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিই। আসুন আমার সঙ্গে।'

ঘরের আলো এবং পাখা বন্ধ করে সুখেন দরজার বাইরে এল। মেয়েটি এবার চাবি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

মেয়েটি যখনই কথা বলছিল তখনই ওর মুখ থেকে খাবলা-খাবলা মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। সুখেন দরজা বন্ধ করে মেয়েটির পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'সাবধানে নামুন।'

মেয়েটি সুখেনের কথা গায়ে মাখল না। সিঁড়ির রানা ধরে ধরে নিজের ঘরে পৌঁছে গেল। ঠাণ্ডা মেশিন চালু থাকায় ঘরটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঘরে ঢুকেই মেয়েটি সোফার ওপর এলিয়ে পড়ল। খানিক আগে যে মেয়েটিকে সুখেন সাজতে দেখেছে, নিপুণ যত্নে শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে দেখেছে এখন সেই মেয়েটিই তার সামনে সোফার ওপর এমনভাবে শুয়ে আছে যাতে তার দিকে তাকাতে পারছে না সুখেন। সম্ভবত প্রবল নেশা মেয়েটির স্বাভাবিক চেতনা লুপ্ত করে দিয়েছে। এই ঘরে কোন ঘড়ি ছিল না। মেয়েটির বাঁ হাতের মণিবন্ধে ঘড়িটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হাতটা সোফা থেকে গড়িয়ে পড়েছে মেঝের ওপর। হাতটা এমনভাবে ঘোরানো যাতে করে ঘড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না। সুখেন মনে মনে যাবার জন্য তৈরি হল। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'কটা বাজে?'

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে মেঝের ওপর থেকে হাতটা তুলে সুখেনের দিকে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ঝুলন্ত অবস্থায় হাতটা রাখার ক্ষমতা আপাতত মেয়েটির নেই। বাধ্য হয়ে সুখেন হাতটা তুলে নিয়ে দেখল একটা বেজে পনেরো মিনিট পার হচ্ছে। মেয়েটির বাঁ হাত আস্তে করে নামিয়ে দেবার আগেই মেয়েটি সুখেনকে ধরে সোফার ওপর উঠে বসতে চাইল। সুখেন ধরে না ফেললে মেয়েটি নির্ঘাৎ পড়ে যেত। সোফার ওপর উঠে বসে ঘোলাটে চোখে সুখেনের দিকে একবার তাকাল। তারপর যখন উঠে দাঁড়াল এবং দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে চলতে আরম্ভ করল তখন বোঝা গেল মেয়েটি তার চলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছে। স্বাভাবিকভাবে পা ফেলতে পারছে না। সে সম্ভবত বুঝতে পারছে না, এখন তার বুকে কোন কাপড় নেই। সেটা গড়াতে গড়াতে তারই সঙ্গে যাচ্ছে

বাথরুমের দিকে। মেয়েটি দাঁড়াবার পরই তার বুকের কাপড় খসে পড়ে গিয়েছিল। এবার সুখেন পেছন থেকে দেখল মেয়েটির ব্লাউসের পেছনের সবকটি হুক খোলা। মাখনের মতো ফর্সা মসৃণ ত্বকে শুধু গোলাপী রঙের একটা ব্রেসিয়ার।

মেয়েটি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই অন্ধের মতো অবলম্বন খোঁজার তাগিদে কিছু একটা ধরবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিল। সুখেনের মনে হল, মেয়েটি দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে গেলে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। মেয়েটির যা অবস্থা তাতে পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ধরল। বলল, 'কোথায় যাবেন ?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'বেসিনের সামনে। বমি করব।'

দেদার মদ গিলে ফেললে মাতালরা বমি করে ফেলে এই তথ্যটুকু সুখেনের জানা ছিল। সে জীবনে বার তিনেক বীয়ার আর মাত্র একবার হুইস্কি খেয়েছিল। খাওয়ার পরিমাণটা খুব সামান্য ছিল বলে সুখেনকে বমি করতে হয়নি। মাতাল পুরুষ মানুষ জীবনে সে অনেক দেখেছে, কিন্তু কোন মাতাল মহিলাকে কখনও সামনাসামনি দেখেনি। এই প্রথম দেখছে। সুখেন মেয়েটিকে নিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। মেয়েটি দু হাতে বেসিনের দুটো প্রান্ত ধরে হড়হড় করে বমি করল। মেয়েটির কোমরে শাড়িটা জড়ানো। শাড়ির বাকি অংশটা নিচে পড়ে আছে। শরীরের যতটুকু অংশ মেয়েটির ঢেকে রাখার কথা ততটুকু অংশ আপাতত নিরাবরণ। ব্লাউসটা পেছন দিক থেকে খোলা। সম্ভবত সেই কারণেই ব্লাউসটা বুকের সামনে ঝুলে আছে। সুখেন দেখল মেয়েটি বমি করার জন্য ওয়াক করে উঠতেই তার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মেয়েটি বেসিনটা ধরে হাঁফাতে হাঁপাতে মুখ তুলে আয়নার দিকে তাকাল। সুখেন নিজেই হাত বাড়িয়ে বেসিনের কলটা খুলে দিল যাতে বেসিনটা পরিষ্কার হয়ে যায়। মেয়েটি মুখে জল তুলে কুলকুচি করল। সুখেন ধীর গলায় বলল, 'চোখে, কানে আর কপালে জল দিন।'

মেয়েটি সুখেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাত বাড়িয়ে জল নিতে গেল কিন্তু পারল না। গোটা শরীর টলছিল। বমি করার পর ওর শরীর নেতিয়ে পড়ছে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে সুখেনকে ধরল। সুখেন কল থেকে জল নিয়ে মেয়েটির চোখে, কানে আর কপালে থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগল। সুখেন বুঝতে পারছে মেয়েটি নিজের শরীরের ভার রাখতে পারছে না। সুখেনের শরীরের ওপর চাপ বাড়ছে। সুখেন হাত বাড়িয়ে তোয়ালে টেনে নিয়ে মেয়েটির মুখ মুছিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে এল।

মেয়েটি নিজের শোবার ঘরের দিকে দেখিয়ে বলল, 'আমি শোব। আমাকে শুইয়ে দাও।'

সুখেন মেয়েটিকে বিছানার কাছে নিয়ে এলো। সন্ধ্যার পরও এই ঘরে সুখেন এসেছিল। তখন ঘরের মধ্যে একটি নিভাঁজ শয্যা দেখে তার মনে হয়েছিল একেই বুঝি বলে যথার্থ সুখশয্যা। এখন সেই শয্যার চেহারা বদলে গেছে। গোটা বিছানাটা আলুথালু। ঘরের টেবিলে খান কয়েক প্লেটে খাবারের উচ্ছিষ্ট, তিনটি শূন্য কাঁচের গ্লাস, আর মেঝেময় ছড়িয়ে আছে পেঁয়াজের টুকরো, শসা, বাদাম এবং সিগারেটের ছাই। গোটা ঘর জুড়ে এমন একটা গন্ধ যা মন বিষিয়ে দেয়। অথচ সুখেন যখন প্রথম এই ঘরে এসেছিল তখন ঘর জুড়ে মন স্নিগ্ধ করার মতো একটা সুবাস সে টের পেয়েছিল। বিছানার দিকে তাকাতেই সুখেনের হঠাৎ করে মনে হয়েছিল এটা এখন এমনই একটা শয্যা যেখানে মানুষ নয়, মাছিকে মানায়। বিছানা জুড়ে যদি ভন ভন করে মাছি উড়ে বেড়াতো তাহলে যেন বেশি স্বাভাবিক দেখাতো সেই দৃশ্যটা। বিছানার সামনে আসতেই মেয়েটি সুখেনের হাত ছাড়িয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

সুখেন প্রায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটির যেন কোন হুঁশ নেই। সে সম্ভবত ভেবে দেখছে না, কিংবা ভুলে গেছে যে তার সামনে বিছানার কোল ঘেঁষে একজন আটাশ বছরের অপরিচিত যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সুখেন আজ পর্যন্ত কোন যুবতীর শরীরকে এত কাছে থেকে এমনভাবে দেখেনি। বুকের নিচ থেকে তলপেটের অনেকটা অংশে কোন আবরণ নেই। মেয়েটি বোধহয় কোমরের অনেকটা নিচে শাড়ি পরে। সায়ার দড়িটা বেশ নিচে বাঁধা। ঘরের ফর্সা আলোয় মেয়েটিকে এখন আরও বেশি ফর্সা দেখাচ্ছে। মেদহীন শরীরে সেই আলো এখন চকচকে করে তুলছে মেয়েটির শরীরকে। দুটো হাত দু পাশে এরোপ্লেনের ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। নিঃশ্বাসের টানে পেট ওঠা-নামা করছে। তলপেটের কাছে টিপের মতো গোলাকৃতি একটা জড়ুল। গভীর নাভিকুণ্ডলের ঠিক নিচেই।

সুখেন এখন কী করবে? তার চলে যাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এখন হয়তো মধ্যরাত। শহরে কোন যানবাহন নেই। ভোর রাত্রে তার অবশ্যই বেরুনো উচিত। দিনের প্রথম ট্রাম অথবা বাসে। সুখেনের হঠাৎই মনে পড়ল তার পকেটে মাত্র দুটো টাকা। জেল থেকে পালিয়ে এসেছে যাদের সঙ্গে তারা তাকে প্রথমে নিয়ে গিয়েছিল একটা জীর্ণ বস্তিতে। সেখান থেকে আত্মরক্ষার জন্য মিলেছে একটা ছুরি আর পাঁচটি টাকা। কলকাতায় পৌঁছবার পর সেই সঞ্চয় এসে ঠেকেছে দু' টাকায়। এই পুঁজি নিয়ে সে এখান থেকে কোথায় এবং

কতদূরে পালাতে পারে ?

সুখেন দেখল মেয়েটি চোখ মেলে তাকিয়েছে। ঘোলাটে চোখের ম্লান দৃষ্টিটা এখন তার দিকে। সুখেন আস্তে আস্তে বলল, 'আমাকে তো একটু পরেই যেতে হবে। আপনি দরজা খুলে না দিলে যেতে পারব না।'

মেয়েটি ক্লান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে ?'

সুখেন শুনল দ্বিতীয়বারও মেয়েটি তাকে 'তুমি' সম্বোধন করছে। সম্ভবত নেশার জন্যই এমনটা হচ্ছে। সুখেন অবাক হলো না। অস্ফুটে বলল, 'ঠিক জানি না। কোন ঠিকানা নেই।'

মেয়েটি বোধহয় হাসবার চেষ্টা করল। ঠোঁটটা ফাঁক হল, ছোট্ট একটু শব্দ বেরুল মাত্র। সুখেন বুঝতে পারছিল না, তার এই ঘরে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা শোভন হচ্ছে কিনা। মেয়েটি এখন মাতাল, তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি কাজ করছে না। কিন্তু সুখেন তো মাতাল নয়। সে কেন এমন আধা উন্মুক্ত এক মাতাল যুবতী শরীরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। সুখেন পাশের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াল। সুখেন চলে যাচ্ছে দেখে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছো ?'

সুখেন জবাব দিল, 'আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি।'

মেয়েটি এবার উঠে বসার চেষ্টা করল। সুখেন দেখল, মেয়েটি বুকের সামনে ঝুলে থাকা ব্লাউসটা খুলে ছুঁড়ে দিল দরজার দিকে। তীক্ষ্ণ দুটি স্তন গোলাপী রঙের ব্রেসিয়ারের মধ্যে থেকে যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেয়েটি আলুথালু হয়ে যাওয়া শাড়িটা টেনে নিয়ে বুকের কাছে জড়ো করল। কোনমতে উঠে বসে পিঠে বালিশ দিয়ে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে সুখেনের দিকে তাকাল। সুখেনের গা শিরশির করে উঠল। সে অনুভবে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল মেয়েটির শরীর, তার এই তাকানো অথবা খানিক আগে মেয়েটির শরীরের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ তার ভেতরে একটা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। মেয়েটি বলল, 'কেন, এই ঘরে বুঝি অপেক্ষা করা যায় না ? ভয় না ঘেন্না ? কিসের জন্য পালাতে চাইছো ?'

সুখেন জানে সত্যি কথাটা এক্ষেত্রে বলা যাবে না। তার মধ্যে মেয়েটিকে নিয়ে কোন ঘৃণা ছিল না। বরং সে ভয় পাচ্ছিল। অন্য রকম ভয়। একটা ব্যাখ্যাতীত অনুভূতি। যেন অনেকটা ইচ্ছের সঙ্গে খানিকটা ভয়, খানিকটা সঙ্কোচ মিলেমিশে অদ্ভুত একটা আকার নিয়েছে। সুখেনের মনে পড়ল, ঠিক এই রকম ভয় সে প্রথম আরও একবার পেয়েছিল তার ষোল বছরের কিশোর বয়সে। সেটা ছিল দগদগে গ্রীষ্মের দুপুর। আকাশ জুড়ে রোদের নিঃশব্দ তাণ্ডব। ঘোষালদের আমবাগানে গুলতি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুখেন। আম

এবং কাঠবেড়ালী দুটোই তার লক্ষ্য। বাগানের মধ্যে রোদ আর ছায়ার সমান আধিপত্য। সুখেন সেই দুপুরে চারপাশ জঙ্গলে ঘেরা ঘোষালদের পুকুরঘাটে দেখেছিল ঘোষালদের বাড়ির কাজের মেয়েটিকে। কী যেন নাম ছিল মেয়েটার ? বোধহয় চাঁপা কিংবা বকুল জাতীয় কিছু একটা হবে। মেয়েটি পেটসমান জলে ডুব দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুকের নিচ থেকে শরীরের একটা অংশ জলের তলায়। বাকি অংশটা জলের ওপরে। মেয়েটির গায়ের রঙ শ্যামলা। অথচ সুখেন দেখল ওর উদ্ধত দুটি বুক, যা জলে ভেজা শঙ্খের মতো, যার ওপরে এখন রৌদ্রের আলো, সেটা ওর গোটা শরীর থেকে ফর্সা। এই নির্জন দুপুরে ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা পুকুর পাড়ে কারো আসার সম্ভাবনা নেই জেনেই চাঁপা অথবা বকুল অন্যান্য দিনের মতোই বেপরোয়া এবং উন্মুক্ত হয়ে স্নান করছিল। হাতে করে আঁজলা-আঁজলা জল তুলে ছিটিয়ে দিচ্ছিল বুকে। ওর দুটো হাত যতবার ওঠানামা করছিল ততবারই কেঁপে কেঁপে উঠছিল ওর সদ্যস্নানে সিক্ত দুটি স্তন। ঘাটের ওপরে রাখা ছিল ওর শুকনো শাড়ি আর সায়া। মেয়েটি জল থেকে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছিল। সুখেনের মনে আছে, সে এক দুরন্ত মুহূর্ত। ভয় আর ভালোলাগা, আকর্ষণ আর আতঙ্ক দুটোই তার বুকের মধ্যে গোটা শরীর জুড়ে যুদ্ধ করছে। মেয়েটি অর্থাৎ চাঁপা, একটা করে পা সিঁড়িতে রাখছে আর জলের তলা থেকে একটু একটু করে উঠে আসছে তার ভেজা শরীর। যেন রহস্যময় কোন বস্তু অথবা অলৌকিক কিছু জল থেকে ওপরে ভেসে উঠছে। সুখেন হাঁফাতে আরম্ভ করল। তার মনে হল চাঁপা যদি তাকে দেখে ফেলে, তাহলে ?

সুখেনের শরীর কাঁপতে আরম্ভ করে দিল। চাঁপার শরীর তখন ক্রমশ উঠে আসছে জলের নিচ থেকে। নাভি ছাড়িয়ে শরীরের অংশটা জল থেকে ওপরে উঠে আসার মুহূর্তেই সুখেন চোখ বুঁজে দৌড় দিল রাস্তার দিকে। সুখেন আর পেছন ফিরে দেখেনি চাঁপা তার দৌড়নোর শব্দে চোখ তুলে তাকিয়েছিল কিনা।

কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই দূর থেকে ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দেখা বা দেখে ফেলা।-কিন্তু এখন এই ঘরের মধ্যে সে যাকে দেখছে সে চাঁপা নয়, তার সামনে মাত্র হাত দেড়েকের দূরত্ব এবং ঝোপ-জঙ্গলের কোন আড়ালও নেই। সুখেন মেয়েটির দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না অথচ তার মন সহস্র চক্ষু হয়ে বার বার মেয়েটির দিকে যেতে চাইছে। ষোল বছর বয়সে সে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু এখন এই আটাশ বছরের সুখেন তো পালিয়েই এখানে এসেছে। এখান থেকে আপাতত তার পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তার জন্যও তাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

সুখেন ঘরের অন্যদিকে দৃষ্টি রেখে বলল, 'ঘেন্না নয়, ভয়ও পাইনি। শুধু আপনাকে একা বিশ্রাম দেবার জন্য আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।'

মেয়েটি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। যেন তাচ্ছিল্য করার ভঙ্গি দেখিয়ে বলল, 'আমি তো একা থাকতে চাইছি না। তুমি থাকো এই ঘরে। আমার অসুবিধে হবে না।'

সুখেন মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। মেয়েটির নাকছাবির পাথরটা চকচক করছে। চুলের বেনী এখন বুকের ওপর। পা দুটো সামনের দিকে ছড়ানো। সায়া এবং শাড়ি দুটোই উঠে এসেছে হাঁটুর কাছাকাছি। কাঁচা বাদামের কোয়ার মতো মসৃণ পায়ের চামড়া। পায়ের নখে চকচক করছে নখ পালিশ। গোড়ালির কাছে শিথিল হয়ে পড়ে আছে রুপোর নূপুর।

সুখেন বলল, 'আপনি কি জোর করছেন?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'যদি করিই তাতেই বা দোষ কোথায়? এখানে আসার পর থেকে তুমি তো কম জোর খাটাওনি। পকেট থেকে ছুরি বার করে মুখের সামনে বার বার ঘুরিয়েছো।'

সুখেন জানে, নেশার মধ্যে থাকলেও মেয়েটা ভুল বলছে না। হয়তো নেশার তীব্রতা কমে এসেছে। সুখেন বলল, 'সেটা শুধু ভয় দেখাবার জন্যে। আপনাকে খুন করার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

মেয়েটি এবার টেনে-টেনে নাটকের সংলাপ বলার মতো করে বলল, 'জানি গো জানি, খুন করতে তুমি আসোনি। খুন করার লোক তুমি নও। তারা অন্যরকম হয়, তাদের আমি চিনি।'

সুখেন এবার ঝট করে বিছানার ওপর, মেয়েটির পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, 'আপনি বলেছিলেন আপনি নাকি আমায় চেনেন? কথাটা সত্যি?'

মেয়েটি জবাব দেওয়ার আগে হাসল। ওর দুই চোখে খুশির আলো জ্বলে উঠে থেমে রইল। শুধু খুশিই নয়, মেয়েটা যেন খানিকটা মজাও পাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে সুখেনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুখেনের মধ্যে অত ধৈর্য ছিল না। সে বলল, 'কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলুন কীভাবে আমায় চেনেন। কোথায় আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল।'

মেয়েটি যেমনভাবে তাকিয়েছিল তেমনভাবেই আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে নিল। একটা সিগারেট সুখেনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অন্যটা নিজের ঠোঁটে চেপে বলল, 'ধরিয়ে দাও।'

সুখেন লাইটার জ্বেলে প্রথমে মেয়েটির সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে পরে নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল জবাবের আশায়। মেয়েটি পরমতৃপ্তিতে

সিগারেট টেনে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সুখেন মনে মনে ভাবল, মেয়েটা সম্পর্কে তার ধারণা কিছুক্ষণ বাদে বাদেই ঘুরপাক খেয়ে বদলে যাচ্ছে। যদি সত্যিই চিনে থাকে তাহলে আমাকে সেই কথাটা না বলে ঢঙ করছে কেন ? মেয়েটি কি সুখেনকে নিয়ে খেলছে ? নিতান্ত মাতাল হয়ে গেছে বলে সুখেন এসব সহ্য করে যাচ্ছে। সে জানে, এই দেশে পাগল আর মাতালরা যেকোন রকম অপকর্ম করেই ক্ষমা পেয়ে যায়। পাগলদের ক্ষমা করার যুক্তিটা বোঝা যায়, কিন্তু মাতালদের ক্ষমার চোখে দেখা হয় কেন ? ওদের স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায় বলে ? কিন্তু এটা তো ইচ্ছাকৃত।

মেয়েটি চোখ খুলে তাকিয়েছে। এবার আর মুখে হাসি নেই। সুখেন জিজ্ঞাসু চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হল বলুন !'

মেয়েটি বাঁ হাতে ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, 'শুনতে খুব কৌতূহল হচ্ছে বুঝি ?'

সুখেন জবাব দিল, 'স্বাভাবিক।'

মেয়েটি বলল, 'কিন্তু সহ্য করতে পারবে ? খারাপ লাগবে না তো ?' সুখেন অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'ন্যাকামি করবেন না। যদি বলতে চান সরাসরি বলুন।'

সুখেনের কথায় মেয়েটি আহত হল কিনা বোঝা গেল না। সুখেন দেখল ঘোলাটে চোখে সুখেনের মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড স্থির তাকিয়ে থেকে মেয়েটি চোখ বুঁজে ফেলল। জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিল, যেহেতু মেয়েটির চোখ বন্ধ, সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না তাই সুখেন পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটিকে দেখল। মেয়েটির বাঁ হাতের কনুই বিছানার ওপর দাঁড় করানো। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। হাতের মুদ্রাটা এখন এমনই যেন সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মডেল। ডান হাতটা বুকের ওপর। এলোমেলো শাড়িটা খানিক আগে গুটিয়ে নিয়েছিল বুকের কাছে। এখনও তেমনই আছে, তবে হাতের বাঁধন শ্লথ হওয়ায় এবং শরীরটা একটু আগে নড়াচড়া করার ফলে কাপড়ের অংশ বিশেষ গড়িয়ে গেছে বাঁ দিকে। সুখেন জানে না, মেয়েটি সত্যিই নেশার ঘোরে এমন করছে নাকি নেশাকে কেন্দ্র করে মাঝ রাতে তার সঙ্গে ছেনালীপনা আরম্ভ করেছে। এতে মেয়েটির কতটুকু লাভ। এই একলা ঘরে একজন সুন্দরী যুবতী যদি মাতলামো আরম্ভ করে, সুখেনকে নিজের বিছানায় বসিয়ে রাখে তাহলে সুখেনের চাইতে মেয়েটার ক্ষতিই তো বেশি। নাকি মেয়েটা একেবারে ভিন্ন স্বভাবের। সুখেনকে অন্যতর কোন ফাঁকা ফাঁদে জড়াতে চাইছে।

কিংবা…

সুখেন সিগারেটের ছাই ফেলে দিয়ে ভাবল, এই মেয়েকে সে যখন প্রথম দেখেছিল তখন তাকে মুহূর্তের জন্যও খারাপ মনে হয়নি। হয়তো মেয়েটি খারাপ নয়, হয়তো এ সেই রকম মেয়ে যাদের পেটে মদ পড়লে স্বভাব একেবারে বদলে যায়। দিনে-রাত্রে তখন ভয়ঙ্কর তফাৎ। এই মেয়েটিও বুঝি মদের জন্যই বদলে গেছে। মেয়েটির সম্পর্কে সুখেনের ধারণা কোন একটা বিন্দুতে স্থির হতে পারছিল না। তার মধ্যে কিশোরকাল থেকেই একটা অদ্ভুত ধারণা থেকে গেছে, সুন্দর চেহারার মানুষ খুব বেশি খারাপ হতে পারে না—বিশেষ করে মেয়েরা। সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে অহঙ্কার থাকলেও এক ধরনের সারল্যও থাকে। এই মেয়েটিও রীতিমতো সুন্দরী। ওর শরীরের অনাবৃত অনেক অংশই এখন ওর চোখের সামনে। শরীরে কোথাও খাদ নেই। সুখেন অনুভবে টের পেতে থাকে, মেয়েটির শরীর তার দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনকেও টানছে। এমন ব্যাপার দিনের বেলা ঘটলে কী হতো সুখেন জানে না। এখন সময়টা মধ্যরাত, চারপাশে স্তব্ধতার অটল বাতাবরণ আর তার মধ্যে দৃষ্টিবন্ধ করে শুয়ে আছে এমন এক যুবতী যার মুখের চারপাশে ঘন হয়ে আসছে মধ্যরাতের শব্দহীন অভিমান। রাতের এই সব মুহূর্তগুলো বড় মারাত্মক, বড় মর্মান্তিক। সুখেনের শরীরের মধ্যে গ্রীষ্মের তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না, মেয়েটির শরীরে কোন যাদু আছে কিনা। কাঁচাবাদামের মতো মসৃণ শরীরে ঈষৎ গোলাপী আভা। নাকছাবিটার পাথর থেকে মাঝে মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল আলো—যেন ওর রহস্যময় শরীরের দিকে চোখ ফেরাবার জন্য ওই আলোটাই হাতছানি দিচ্ছে। সুখেন বুঝতে পারছিল আটাশ বছরের পুরুষ-শরীর বড় অবাধ্য। তার চারপাশে বিপদ আর অনিশ্চয়তার কথা ভুলিয়ে দিয়ে ওই মেয়েটার আধা উন্মুক্ত শরীর তাকে ভেতরে ভেতরে তছনছ করতে লাগল।

মেয়েটি হঠাৎ চোখ খুলে তাকাতেই সুখেন দৃষ্টি সরিয়ে নিল। মেয়েটি সিগারেটে একটা টান দিয়ে বাকিটা ছাইদানীতে গুঁজে দিয়ে উঠে বসল। নিচু হয়ে হাত বাড়াল খাটের নিচে। সেখান থেকে টেনে আনল মদের বোতল, যার বারো আনাই খরচ হয়ে গেছে। বিছানার পাশেই টেবিল। সেই টেবিলের ওপর তিনটে শূন্য গ্লাস ছিল, তারই একটাতে মদ ঢেলে মেয়েটি জল মেশালো।

সুখেন দেখল মেয়েটা সেই গ্লাস তুলে নিচ্ছে মুখের কাছে। সুখেন বলল, 'একটু আগেই তো বমি করলেন। এখন আবার খাচ্ছেন কেন?'

মেয়েটি ভাষাহীন চোখে তাকালো। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'তুমি খাবে?'

সুখেন মনে মনে ভাবল, আমার পক্ষে মদ খাওয়ার এটাই তো উপযুক্ত

সময়। কিন্তু মুখে বলল, 'না।'

মেয়েটি বলল, 'তোমার খেতে ইচ্ছে করে না? কখনও খাওনি?'

সুখেন জবাব দিল, 'খেয়েছি, কিন্তু ইচ্ছে করে না।'

মেয়েটি এবার বিদ্রূপের চোখে তাকিয়ে বলল, 'চরিত্র রক্ষা করছো? তা ভাল।'

সুখেন আগে হলে বিরক্ত হতো। এখন কেন জানি না, সে বিরক্ত হতে পারল না। মেয়েটি নির্ঘাৎ তার মধ্যে একটা আকর্ষণ তৈরি করেছে। তবুও মনের ভাব গোপন করে সে বিরক্ত হবার ভান করে বলল, 'অনেকক্ষণ আগে আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম…'

সুখেনকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, 'জানি। সেই কথাটা বলবার জন্যই তো একটু মদ খেয়ে নিচ্ছি। শোনবার জন্যে তোমারও খাওয়া উচিত ছিল। ভেবে দেখ খাবে কিনা।'

সুখেন এবার খর চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কঠোর ভাষায় কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলতে পারল না। মেয়েটি মদের গ্লাস থুতনীর কাছে চেপে ধরে স্থির হয়ে আছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে বোধহয় ভেতর থেকে উঠে আসা কোন কষ্টকে আটকাতে চাইছিল। মেয়েটির ঘোলাটে চোখে চিকচিক করছে জলের আভাস। সুখেন জানে বেশি মদ খেলে নাকি অনেকে কাঁদতেও থাকে। তাদের বারাসাতে এক প্রবীণ মাতাল ছিল। নেশা বেশি হয়ে গেলেই সে হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিত। দেশের মানুষের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার কথা তখন তার মনে পড়ে যেত। এই জনদরদী মাতাল বাবার সাহায্যে পঞ্চায়েতে জিতে এখন প্রধান হয়ে আছে। মদ খেলে সে নাকি এখনও কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই এই প্রবীণ মাতাল একদিন তার বাবাকে বলে ফেলেছিল, 'অমলেন্দুবাবু, আপনি আমার সত্যিকারের বন্ধু। আপনার মতো খচ্চর আমার পাশে না থাকলে আমি কিছুতেই প্রধান হতে পারতাম না। খচরামীতে আপনার জুড়ি নেই।'

সুখেন মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল এর কান্নাটাও নিছক মাতলামী কিনা। মেয়েটি বোধহয় তার নিজের মধ্যে অথবা নেশার মধ্যে ডুবে ছিল। সুখেনকে সে খেয়াল করছিল না। সম্ভবত তার খেয়ালই ছিল না যে ঘরের মধ্যে তারই বিছানার পাশে আটাশ বছরের একজন সমর্থ যুবক তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি খেয়াল থাকতো তাহলে নিজেকে এতখানি উন্মুক্ত করে সে বসে থাকতে পারতো না। বস্তুত এখন তার পরনে ঢিলে ঢালা কালো রঙের একটি সায়া যা হাঁটুর কাছাকাছি উঠে এসেছে এবং স্বচ্ছ কাপড়ের

বক্ষ বন্ধনী ছাড়া শরীরে আর কোন আবরণ নেই। মেয়েটি হঠাৎ গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে আবার খাটের নিচে হাত বাড়িয়ে বোতলটা তুলে আনল টেবিলের ওপর।

সুখেন এবার ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কী হচ্ছে এটা! সহ্য করতে পারছেন না তবু আবার খাচ্ছেন।'

মেয়েটি সুখেনের কথায় আমল দিল না। গ্লাসে মদ ঢেলে জল মেশাতে মেশাতে বলল, 'সহ্য করতে পারিনা এমন বহু জিনিসই তো মেনে নিতে হয়। হয় না?'

সুখেন এটাও জানে, পেটে মদ পড়লে কেউ কেউ দার্শনিক হয়ে যায়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে। সুখেন জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটিকে বলল, 'ঘড়িতে কটা বাজে?'

মেয়েটি গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসল। তরল গলায় বলল, 'বেশি বাজেনি। অত তাড়া কিসের? যাবে তো বারাসাতে। শিয়ালদা থেকে ফার্স্ট ট্রেন ছাড়তে এখনও ঢের দেরি।'

সুখেন ভেতরে ভেতরে চমকে উঠে মেয়েটির দিকে তাকাল। তার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। মেয়েটি কে? সুখেন যে বারাসাতের ছেলে সে কথাটা ওর জানবার নয়, অথচ যেভাবেই হোক ঠিক জেনেছে। মেয়েটি কি তাহলে আগে বাবাসাতে থাকতো? ওর স্বামী, লোকটা কে? এই ঘরে যারা এসে মদ্যপান করে গেছে, যাদের সঙ্গে বসে মেয়েটিও মদ খেয়েছে তারাই বা কারা? সুখেনের বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে লাগল। সে তীব্রচোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি কে? আমাকে কেমনভাবে চেনেন? ধ্যাষ্টামী না করে সোজা ভাষায় উত্তর দিন।'

সুখেন আগুন চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি হাসবার চেষ্টা করল। হাসি ফুটল না। তার মাতাল চোখ ভাসিয়ে সহসা কান্না নেমে এলো।

॥ ৫ ॥

সুখেন যখন শিয়ালদা থেকে রওনা হয়েছিল তখনও কলকাতা ভাল করে জাগেনি। স্টেশন চত্বরটা অবশ্য বেশ জম-জমাট ছিল। খবরের কাগজের হকার, কাগজের ভ্যান, তার বিলি ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ততা আর কোলাহলে জায়গাটা তখন অন্যরকম। সুখেন ওই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাগজ দেখবার চেষ্টা করল। একজন পুলিশ, সম্ভবত কনেস্টবল, একটা বাংলা কাগজ দু'হাতে মেলে পড়ছিল। সুখেন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। কাগজে লোকটার মুখ অনেকখানিই

ঢাকা। সুখেনের নজর ছিল মেলে ধরা কাগজটার ওপর। উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে কাগজটা দেখে নিচ্ছিল। উল্টোদিকে দাঁড়ানোর ফলে সে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা এবং শেষ পৃষ্ঠাটাই শুধু দেখতে পেল। সুখেনের মতো কোন জেল পলাতক কয়েদীর খবর প্রথম পাতায় থাকবার কথা নয়। শেষ পাতাটায় খেলার খবর থাকে। সেখানেও তার পালানোর খবর থাকবে না। যদি থেকেও থাকে তাহলে হয়তো ভেতরের কোন পাতায় থাকবে। ভাল লোকদের মতো খারাপ লোকদেরও নানা শ্রেণীবিন্যাস আছে। সব আসামীই খবরের যোগ্য নয়। সব পলাতকই পযলানম্বরেব পাতার খবর হয়না। সে সব থাকে শোভরাজ, ফুলনদেবী কিংবা অন্যান্যদের জন্য। পৃথিবীব সব দেশেই বোধহয় প্রথমশ্রেণীর প্রতারক, খুনে, ডাকাত আর বদমাইসদের খবর দেশের যেকোন কৃতী মানুষের চাইতে বেশি প্রচার পেয়ে থাকে। কাগজে যদি তার খবরটা আদৌ না বার হয় তাহলে সে মনে মনে খুশি হবে। বেশি জানাজানি হয়ে গেলে তারই বিপদ। প্রথম এবং শেষপাতা দেখা শেষ করে সুখেন ভেতরের পাতাগুলো দেখবার জন্যে যখন লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবছে তখনই লোকটি মুখের সামনে থেকে কাগজটা নামাতেই সুখেন ভেতরে ভেতরে বিষম চমকে উঠে দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশের মুখোমুখি।

পুলিশটি কাগজটা মুখেব সামনে থেকে নামিয়ে খানিকক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ পিটপিট কবতে করতে কী যেন ভাবল। তারপর কাগজটা, পেছনে বসে যে সব হকার কাগজ গোছাচ্ছিল তাদেরই একজনকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'এই নে রে। কাগজে ভাল কোন খবর নাই। দাঙ্গা, মারপিট আর রাজনীতির খিচুড়ি-ধ্যাৎ!'

প্রতিদিনের কাগজের কাছে পাঠকদের কি বিশেষ কোন সংবাদের প্রত্যাশা থাকে? সুখেন ঠিক জানেনা। এই খাঁকি পোশাকপরা ভদ্রলোকটি কি তারই মতো বিশেষ কোন সংবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছেন? সুখেন নিঃশব্দে সরে পড়বার জন্য পা বাড়াচ্ছিল। যদিও সে এখন একটা ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। তার সেই ক্লিন্ন পোশাকটি সে বদলাতে পেরেছে। বিনিময়ে সে পেয়েছে জিন্সের প্যান্ট এবং বুশ সার্ট। সার্টটা ঠিক চলে যায়। এখন একটু ঢিলেঢালা পোশাক বেমানান নয়। কিন্তু প্যান্টটা মাপে ছোট হয়ে গেছে। কোমরটা বেশ ছোট। একটা সাইজ বড় হলে কোন অসুবিধা হতো না। গালের দাড়িটাও সে কামিয়ে নিয়েছে। আগে যেমন তাকে দেখলেই বোঝা যেত লোকটা যেন তাড়া খেয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে এখন চট্ করে সেটা বোঝবার উপায় নেই। মেয়েটির ঘরের আয়নায় নিজেকে দেখে তাড়া খাওয়া যুবক বলেই তার মনে হয়েছিল। তাকে দেখে

অন্যদেরও ঠিক তেমনটি মনে হতো কিনা সেটা অবশ্য সে জানেনা। নিজের ধারণাটা দিয়েই সে অনুমান করে নিচ্ছিল তাকে দেখলে অন্যদেরও তারই মতো ধারণা হবে। অন্তত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পুলিশের চোখকে সে বিশ্বাস করে না। আর এখন তো খাঁকি রঙটাই তার দৃষ্টিকে চমকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সুখেন পা বাড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এগোতে পারল না। পুলিশটি তাকে ডাকল। সুখেনের শুনতে ভুল হওয়ার কোন কারণ নেই। এক হাতেরও কম দূরত্বে সে দাঁড়িয়ে। খাঁকি পোশাক পরা, সুখেনের পক্ষে ভীতিকর সেই লোকটি তাকে 'শুনুন' বলে শুধু পেছন থেকে ডাকই দেয়নি, হাত বাড়িয়ে তার কাঁধের কাছটাও ছুঁয়ে ফেলেছে। এখন এই ডাক এবং স্পর্শকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া সুখেনের পক্ষে সম্ভব নয়। প্যান্টের হিপ পকেটে যে সামান্য অস্ত্রটা আছে সেটা এক্ষেত্রে হাস্যকর। পুলিশ ভদ্রলোকটির কাঁধে রয়েছে বন্দুক। সুখেন বাধ্য হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। পুলিশ তাব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পুলিশটি বুক পকেট থেকে একটা সিগারেট বার কবে বলল, 'আপনার আগুনটা একটু দ্যান তো।'

সুখেন ইচ্ছে করলেই পকেট থেকে লাইটারটা এগিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু দিল না। নিজের অর্ধেক খাওয়া সিগারেট এগিয়ে ধরল। পুলিশটি বোধহয় এই রকমই আশা করেছিল। সুখেনের সিগারেট থেকে নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নিতে নিতে সুখেনের দিকে তাকালো। সুখেন ভাবল, লোকটাব মধ্যে কি কোন অভিসন্ধি রয়েছে? ওর তাকানোটা কি সন্দেহজনক? সুখেন নিজেকে যথাসম্ভব নির্বিকার রাখাব চেষ্টা করল। সিগারেটটা ফিরিয়ে দিতে দিতে পরম দার্শনিকের মতো পুলিশটি বলল, 'মরনিং শোজ দি ডে, প্রভাতেই দিনের পরিচয়। এই প্রভাতেই যেরকম ভ্যাপসা গরম তাতে গোটা দিনখান একেবারে জ্বালাইয়া দিব।' সুখেনের দাঁড়িয়ে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিজেকে অধিকতর স্বাভাবিক করার তাগিদে সে একটা খবরের কাগজ কিনে নিল। প্রয়োজনে মুখের সামনে আড়াল তৈরি করার ব্যাপাবে খবরের কাগজের চাইতে ভদ্র এবং সহজ উপায় আর নেই। কাগজ কিনতে গিয়ে সে ইচ্ছে করেই ইংবেজি কাগজ কিনে নিল। সে জানে, সকালবেলা হাতে কাগজ নিয়ে ট্রেনে উঠলে বহু যাত্রীই একটা দুটো করে পাতা চেয়ে নেয় পড়বাব জন্য। ইংরেজি কাগজ চাইবার লোক অপেক্ষাকৃত কম। কাগজ কেনবার সময় আড়চোখে সে পুলিশটির দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা বাচ্চা ছেলে কেটলি করে চা ফিরি করছিল। পুলিশটি তখন তার কাছ থেকে ভাঁড়ে করে চা নিয়ে খেতে ব্যস্ত। ছেলেটাকে পয়সা দিল কিনা সেটা সুখেন দেখতে পেল না।

স্টেশনে এসে সুখেন দেখল দিনের প্রথম বনগাঁ লোকালটা তখনও দাঁড়িয়ে

আছে। এখন বারাসাতে যাওয়া তার পক্ষে নিরাপদ নয়। তবু তাকে যেতে হবে। সিদ্ধান্তটা বদলে নিতে হয়েছে মেয়েটির জন্যই। অবশ্য এখন আর ওকে শুধু মেয়েটি বলার আর কোন সঙ্গত কারণ নেই। যতক্ষণ ওর নাম জানা ছিল না, ততক্ষণ মেয়েটি বলে মনে মনে সম্বোধন করা গেছে। সুখেন জানালার পাশে বসতে বসতে বলল, 'কঠিন গদ্যের মতো নির্মম জীবন যার তারই নাম কবিতা। কে নাম রেখেছিল ? বাবা না মা ? নাম রাখার সময় তো বোঝা যায় না জীবন কেমন হবে। সুখেনের নাম রেখেছিল তার জ্যাঠামশাই নির্মলেন্দু মুখার্জি। তখন কি সে ভেবেছিল এই সুখেন তাদের সবার দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে। ঠাকুর্দা অথবা ঠাকুরমা কিংবা দাদামশাই এঁদের মধ্যে থেকেই কেউ না কেউ বাবা-জ্যাঠাদের নাম রেখেছিলেন নির্মলেন্দু এবং অমলেন্দু। তাঁরা আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কেউ আর দেখে যেতে পারেননি তাঁদের দেওয়া নাম কতখানি নির্মল আর অমল হয়ে পরবর্তীকালে শোভা পাচ্ছে। নামটা নিতান্তই পরিচয়ের বাহ্যিক একটা খোলসমাত্র। নামের সঙ্গে মানুষটার কোন মিল অনেকক্ষেত্রেই হয়না। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী দেদার লোকেদের নাম ঠাকুর-দেবতার নাম দিয়ে। ঈশ্বরভক্ত কেউ কেউ সন্তানদের নাম রাখেন তাঁর আরাধ্য দেব-দেবীর নামে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন, সারাদিনে যতবার সন্তানের নাম ধরে ডাকবেন ততবারই পরোক্ষে আরাধ্যদেবতাকে ডাকা হয়ে যাবে।

জানালার পাশ দিয়ে একজন চা-ওয়ালা যাচ্ছিল। সুখেন এক ভাঁড় চা নিয়ে জানালার নিচে সমতল জায়গাটায় রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। স্টেশনের চায়ের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। অনভিজ্ঞরা জানেনা। এর স্বাদটাই যে শুধু জগৎ ছাড়া তা নয়, এর তাপটাও মাত্রাছাড়া। কেটলি থেকে ঢালার পর মুখে দিলে নির্ঘাৎ জিভ পুড়বে। খানিকবাদে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে সুখেনের মনে হল, যেসব কমিউনিস্ট নেতাদের নাম ঈশ্বরের নামে তাদের সেই নামগুলি যাঁরা রেখেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন না। যদি তাই থাকবেন তাহলে আর প্রিয়জনের নাম হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণপদ, বুদ্ধদেব, ভবানী এরকম রাখতে যাবেন কেন। নামের সঙ্গে কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। মুখে বুলি ফোটার আগে নাম ঠিক করে ফেলা হয়। তারপর সময়ের টানে মানুষটা বড় হয় আর বদলাতে থাকে। কেউ কেউ বদলে যায় নিজের ইচ্ছায়, কেউ কেউ বদলে যায় অন্যের ইচ্ছায়। রাসেল স্ট্রীটের ওই ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়েটি, যার নাম কবিতা, তার জীবনে কোন ছন্দ নেই। গদ্যের কঠিন জীবন তাকে মেনে নিতে হয়েছে। নামের থেকে মানুষটা, অর্থাৎ ওই মেয়েটা অনেক দূরে সরে গেছে।

সুখেন ভাবল, একেই কি লোকেরা নিয়তি বলে ? তাড়া খেয়ে অথবা ভয়

পেয়ে পালাতে পালাতে সে তো অন্য কারো দরজাতেও যেতে পারতো। তার নিয়তিই কি তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল কবিতার ঘরে? যে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে দুর্লভ এক অভিজ্ঞতা। কবিতার মাতাল চোখ যখন শাণিত ছুরির মতো ঝকঝকে দেখাচ্ছিল, যখন তার সারামুখ জুড়ে থিকথিক করছিল ঘৃণা আর তীব্র অপমানবোধ তখন সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারছিল তার বুকের মধ্যে রক্তপাত হচ্ছে। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে জেগে উঠছে অসহায় আক্রোশ। এরকম আক্রোশেব কোন গভীর তাৎপর্য নেই। সে জানে, অন্য দশজন সাধারণ যুবকের চাইতে এখন সে বেশি অসহায়। তার পেছনে ধাওয়া করছে বিপদ। স্বল্পকালীন জেলের অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে জেল জিনিসটা কেমন। পেছনে এবং দু'পাশে দুর্ভেদ্য নিরেট দেওয়াল আর সামনে লোহার গরাদ। দিনের আলো সেই গরাদের সামনে আসে না। তিনদিকের কঠিন বেষ্টনী আর একদিকের লোহার গরাদের মধ্যে একটা জীবন শুধু প্রাণে বেঁচে থাকতে পাবে, তার বাইরে আর কিছুই সে পারে না। এই না পারার যন্ত্রণা এত গভীর যে সুখেনকে পাগল করে তুলেছিল। সেই যন্ত্রণার ঘরে নিষ্ঠুর নির্বাসনের জীবন থেকে সে পালিয়েছে। সেখানে আর সে ফিরে যেতে চায় না। ওই জীবনে কোন আকাশ নেই, সূর্যোদয় নেই, বাইরের বাতাস অথবা আলো-অন্ধকারের কোন প্রাকৃতিক মায়া নেই। নিজেকে ইচ্ছে মতো চালাবার অথবা খুশিমতো কাজ করবার কোন স্বাধীনতা নেই। সেপাই, সেন্ট্রিদের কর্কশ বুটের আওয়াজে সেখানে মানুষের স্বাধীনতা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করছে। সে যদি সত্যিই অপরাধ করে থাকতো, তার হাতে যদি নিরপরাধ কোন মানুষ খুন হতো তাহলে এই বন্দী জীবন মেনে নিতে হয়তো আপত্তি হতো না। সাজা হিসাবে এই কঠিন জীবনকে সে কয়েক বছরের জন্য গ্রহণ করতে পারতো। জেলের মধ্যে অনেকেই তো তাই করছে। অথচ যে অপরাধ সে করেনি তার জন্য তাকে কেন মিথ্যে সাজা খাটতে হবে। আদালতে কালো পোশাক পরে যারা ন্যায়-অন্যায়ের ফয়সালা করে তারা সত্যের চাইতে বেশি নির্ভর করে সাক্ষীর বয়ানের ওপর। সব সাক্ষীই কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াবার সময় ধর্মের নামে সত্য কথা বলার শপথ করে অথচ সব হাকিমই জানেন, সব সাক্ষী সত্য কথা বলে না। উকিলের শেখানো কথাই বলে যায়। সেই সাজানো মিথ্যার নিপুণ কারসাজিতে সুখেনের মতো অনেককে জেলে যেতে হয়। আবার অনেক খুনী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। সুখেনের বুকের মধ্যে ঠিক এই সব মুহূর্তেই অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে থাকে। তার মনে হয় সে দুনিয়ার সমস্ত কিছু ওলোট-পালট করে দেয়। একটা উল্কাপিণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর গতিতে ঝাঁপিয়ে

পড়তে ইচ্ছে করে সমস্ত ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও তার তাই মনে হতো। তাকে জেরা করতো একজন ট্যারা উকিল। লোকটি এত প্রবল ট্যারা যে, সে যখন সুখেনের মুখের দিকে তাকাতো তখন মনে হতো সুখেনকে নয়, সে যেন তাকিয়ে আছে সুখেনের তিন হাত পেছনে দাঁড়ানো পুলিশটার দিকে। কোর্টে মামলা চলার সময় অনেকবারই সেই ট্যারা উকিল, যার নাম আবার নলিনাক্ষ মজুমদার তাকে প্রশ্ন কববার আগে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, 'বেশি বাহুল্য কথা বলবেন না। যা জিজ্ঞেস করব তার উত্তরে শুধু হ্যাঁ কিংবা না বলবেন।'

সুখেন তখনও জানেনা তাকে কী জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল সব প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র ওই দুটি শব্দে দিলে উকিলের মামলা জেতার সুবিধা হতে পারে কিন্তু তাতে সত্য প্রকাশিত হবে না। তখনই তার মনে পড়ে গিয়েছিল এক বাঙালী লেখকের লেখা একটি গল্পের কথা। সেই গল্পের নায়ককেও উকিল একই কথা বলায় সে যা ভেবেছিল সুখেনও মনে মনে প্রায় তাই ভাবতে ভাবতে উকিলকে বলল, 'তা হয় না। আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন দীনবন্ধু সাহাকে খুন করার সময় তার চোখে চশমা ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ কিংবা না বলা মানেই স্বীকার করে নেওয়া খুন আমিই করেছি অথবা খুনের সময় আমি হাজির ছিলাম।'

নলিনাক্ষ উকিল ভাবতে পারেনি আসামী নিজেই এমন একটা ফ্যাকড়া তুলতে পারে। সুখেন তার বক্তব্য শেষ করেই হাকিমের দিকে তাকিয়েছিল। হাকিম সুখেনের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিয়েছিলেন, 'আপনি নিজে যতটুকু বলা প্রয়োজন মনে করেন ততটুকুই বলবেন।'

নলিনাক্ষ আর আপত্তি করেনি।

গাড়িটা সিটি বাজিয়ে ছেড়ে দিতেই সুখেন সিগারেট ধরাল। দিনের প্রথম ট্রেন বলে লোক বেশি নেই। লোক বাড়লে কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরবার দরকার হবে। বারাসাত স্টেশনে নামাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। স্টেশনের সব রিকশাওয়ালাই চেয়ারম্যানের ছেলেকে চেনে। তার চাইতে আগের স্টেশনে নেমে একটুখানি পথ বাসে কিংবা অটোতে যাওয়াই ভাল। শ্রীপল্লী জায়গাটা বারাসাত স্টেশন থেকে একটু দূরে। তাকে এখন সেখানেই যেতে হবে। অটোওয়ালারা সবাই সুখেনকে হয়তো চেনেনা। চিনলেও হয়তো জানেনা, সে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু বারাসাতের রিক্সা চালকরা কথাটা বাবার কানে পৌঁছে দেবে। ওঁদের মুখ থেকে কথাটা ছড়াতে থাকবে। দুপুরের আগেই সেটা পৌঁছে যাবে থানার দারোগাবাবুর কাছে। অটোতে অন্তত

সেরকম আশঙ্কা নেই।

যদিও সে জানে এখন বনগাঁ লাইনের ট্রেনে ওঠা মানেই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। কবিতার রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাট থেকে তাকে অন্য কোথাও যেতে হতোই। ঠিক কোথায় যাবে তার জানা ছিল না। সে শুধু মনে মনে ভেবে রেখেছিল, যেদিকেই যাই না কেন বারাসাত লাইনে নয়। বারাসাত মানেই বাবা-জ্যাঠার কানে খবর পৌঁছে দেওয়া। ওরা যে সময় সুখেনকে সাহায্য করবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল, জ্যাঠামশাই নিজে দেখা করতে এসেছিল সে সময় সুখেন তাদের সাহায্য ফিরিয়ে দিয়েছে। কলকাতার খুব নাম ডাকওয়ালা একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে জ্যাঠামশাই এসেছিলেন। সুখেন তাকে আগে কখনও দেখেনি কিন্তু খবরের কাগজে তার বিস্তর নাম দেখেছে। গৃহবধূ হত্যা মামলার কোর্ট রিপোর্টে তার নাম প্রায়ই বেরুতো। সুখেন জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাকেও ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। জ্যাঠামশাই নিজে যে শুধু রেগে গিয়েছিল তাই নয়, তার চোখ-মুখ দেখে সুখেন বুঝতে পেরেছিল বারাসাতের ডাকসাইটে উকিল এবং একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত নির্মলেন্দু মুখার্জি রীতিমতো অপমানিত বোধ করে ফিরে যাচ্ছে। যাবার আগে তাদের বংশের ধারা অনুযায়ী গরগরে গলায় চাপা হুঙ্কার তুলে বলেছিল, 'তোর সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক রইল না। তুই মর কিংবা জেলে গিয়ে পচতে থাক সে সব নিয়ে আমাদের আর কোন দায় নেই।'

সুখেন দেখেছে, তার বাবা-জ্যাঠারা বেজায় রেগে গেলে তাদের গলার স্বরে গরগর করে একটা আওয়াজ বেরোয়। সুখেন রেগে গেলেও তেমন আওয়াজ হয় কিনা সুখেন জানেনা। গলায় হুঙ্কার তোলার আগে এই গরগরে আওয়াজটাও কি তাদের উত্তরাধিকার? ঠাকুদাকে ঠিক মনে নেই সুখেনের। তবে তাঁর সংক্ষিপ্ত এবং সরল জীবনচরিত সুখেন আত্মীয় স্বজনদের মুখে খণ্ড-খণ্ড আকারে বিভিন্ন সময় যা শুনেছে তার থেকে মোটামুটি ধারণা করা যায় যে, তিনি ছিলেন অতিশয় দুঁদে এবং দয়ালু খচ্চর। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতিতে দয়া আর খচরামির বিরল সহাবস্থান ছিল। জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের চাকরী দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন এবং নিজের বয়স পঞ্চাশ পেরোবার আগেই তিনি নিজেই ছোটখাটো জমিদার হয়ে গিয়েছিলেন। পুরনো মালিক ততদিনে দেহ রেখেছেন। না রেখে উপায়ও ছিল না। পেটের লিভার তখন ফুটিফাটা। কলজের মধ্যেও ছিদ্র দেখা দিয়েছে। জমিদারীর অর্ধেক গেছে শরিকি ভাগ-বাটোয়ারায় আর বাকী অর্ধেকের বারোআনাই ঠাকুর্দার কবজায়। মোক্ষম দুটো অসুখ সে বাঁধিয়েছিল। তার থেকে বাঁচিয়ে তোলার সাধ্য হয়তো ভগবানেরও ছিল না। কিন্তু সেই

হতভাগ্য জমিদার শেষ পর্যন্ত মরল হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ হয়ে। সম্ভবত সেইদিনই সে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে পেরেছিল যে তার বিশ্বস্ত নায়েব তাকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। প্রাক্তন প্রভুর মৃত্যুতে ঠাকুর্দা খুবই শোক পেয়েছিলেন। নিজের খরচে তাব ষোড়শ উপচারে দানসাগর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। জমিদারের বিধবা পত্নীর দেখভালের দায়িত্বও পালন করেছিলেন দীর্ঘদিন। জমিদার গিন্নি যখন স্বামীর বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কাশীবাসী হলেন তখনও নাকি ঠাকুর্দা নিজে গিয়ে তাকে হাওড়া স্টেশনের গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু নিজে জমিদার হয়ে বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। প্রথমে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে বিছানা নিলেন তারপর সেই বিছানাতেই একদিন ভোররাত্রে বার কয়েক হিক্কা তুলে মারা গেলেন। বাবার ঘরে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার হলদে হয়ে যাওয়া বিবর্ণ একটা ছবি আছে। ঠাকুর্দা হাতলওলা চেয়ারে বসে। পায়ে পাম্পশু জুতো এবং মেঝের ওপর লুটিয়ে আছে চওড়া পাড়ের চুনোট কবা ধুতির কোঁচা। ঠাকুমা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বসে আছেন সেই ঠাকুর্দার পায়ের কাছে। ছোটবেলায় যখন এই ছবিটা দেখতো তখন সুখেনের মনে হতো তার ঠাকুর্দা বোধহয় পালোয়ান ছিলেন। পালোয়ান এবং রাগী। তার এমনও মনে হতো, ঠাকুর্দা যেন ছবির ভেতর থেকেই তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। হয়তো কোন রকম বেয়াদপিব জন্য এখনই গর্জন করে উঠবেন। ঠাকুমাকে দেখে মনে পড়তো শৈল চক্রবর্তীর আঁকা অভিমানী অহল্যাব কথা। বড় হয়ে অর্থাৎ ঠাকুমা মারা যাবার অনেকদিন পরে ওই ছবির দিকে তাকালে তার মনে পড়ে যেত অন্য ছবি। ঠাকুমার মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে তার কাঠের বাক্সো থেকে বেরিয়েছিল বিয়ের বেনারসী, তাঁরই হাতে তৈরি নকশা করা কাঁথা, উলের মোজা আর একটা খাতা। মা-জেঠিমা শাড়ি, কাঁথা আর রানীর মাথাওয়ালা কাঁচা টাকাগুলো নিয়ে বেশ ছিল। সুখেন হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছিল সেই খাতাটা। খাতার প্রথম পাতায় ঠাকুমার নাম। শ্রীমতী প্রভাবতী মুখোপাধ্যায়। ঠাকুমার বাবা ছিলেন টোলের পণ্ডিত। সেইসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রও চর্চা করতেন। পণ্ডিত হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যায় যে তিনি কৃতী ছিলেন না সে তো একমাত্র মেয়ের পাত্র নির্বাচনেই বিলক্ষণ বোঝা গেছে। ঠাকুমা সে যুগের তুলনায় বিদূষীই ছিলেন। বিদূষী এবং মোটামুটি সুশ্রী। ওই খাতা থেকেই সুখেন জানতে পেরেছিল ঠাকুমা বাড়ির পুরুষদের চোখ বাঁচিয়ে কবিতা লিখতেন। কবিতার জন্যই পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সুখেন পৌঁছে গিয়েছিল খাতার সেই জায়গায় যেখানে চরম অপমানে

আর বেদনায় ঠাকুমা তাঁর আত্মজীবনী, ঠিক আত্মজীবনীও নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড বিবরণ লিখে গেছেন। ঠাকুমা তাঁর শ্বশুর বাড়িটাকে বলছেন খাঁচা। সময় মতো দানা-পানির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পায়ে এবং মনে বেড়ি পরানো। খাঁচার পাখির বেড়ি থাকে পায়ে, আমার মনেও বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই খাতার এক জায়গাতেই ঠাকুমা লিখেছেন, ফুলশয্যার দিন স্বামী আমার বিছানায় আসিল ভোর রাত্রে। জিজ্ঞেস করিবার সাহস হয় নাই এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তাহার গোটা শরীর হইতে উৎকট একটা গন্ধ বাহির হইতেছিল। এমনতর কোন গন্ধের সহিত আমার কস্মিনকালেও পরিচয় ঘটে নাই। পরে জানিযাছিলাম, উহা মদের গন্ধ। প্রথমে বুঝি নাই, পরে জানিয়াছিলাম, গঞ্জের সন্নিকটে একটি পতিতাপল্লী আছে। উনি মাঝে-মাঝেই সেইখানে রাত্রিবাস করেন। জমিদারী সংক্রান্ত কোন কর্মে কলিকাতা যাইতে হইলে তিনি আদালতে যাইবার পূর্বে কালীঘাটে যাইয়া মাতৃদর্শন করিতেন। তাহার পর আদালত হইতে কর্ম সম্পাদন করিয়া সোনাগাছি নামক একটি স্থানে যাইয়া রাত্রিবাস করিতেন এবং প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া ঠনঠনিয়াতে পূজা দিয়া সেই প্রসাদ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ভগবানভক্তি এবং বেশ্যাসক্তি দুইটাই আমার স্বামীর মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। তথাপি এই স্বামীকে একদিনের তরেও অশ্রদ্ধা করিবার উপায় ছিল না। আমাদিগকে কেবলমাত্র সহ্য করিবার এবং শ্রদ্ধা করিবার দায় দেওয়া হইয়াছিল, প্রশ্ন করিবার দায়িত্ব বা অধিকার দেওয়া হয় নাই। রাত্রের শয্যায় আসিলে পতিতাপল্লীর বারাঙ্গনা নারীদের সহিত রাজপত্নীর কোনরূপ তফাৎ আছে তাহা আমার স্বামী মনে করিতেন না। তাঁহার নিষ্ঠুর সোহাগে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত। চোখের জলে দৃষ্টি ভাসাইয়া দিয়া মনে মনে ভাবিতাম, এহেন সহবাসের সহিত বলাৎকারের পার্থক্য কতটুকু। জগতের সমস্ত স্বামীরাই নিজ পত্নীকে জ্ঞানে-অজ্ঞানে বলাৎকার করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের বাসনাই শেষ কথা, স্ত্রীদের বাসনার খোঁজ লইবার কোনরূপ আবশ্যকতা ইহারা বোধ করে না।'

ঠাকুমার এই খাতাটা সুখেন দীর্ঘদিন নিজের কাছে গোপনে রেখে দিয়েছিল। ঠাকুমা পুরোটা লিখে যেতে পারেননি। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সব মেনে নিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলেন। বাপের বাড়ির শিক্ষা এবং সংস্কৃতি আস্তে আস্তে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন নতুন জীবনযাত্রায়। সুখেনের জীবনে এই খাতাটাই একদিন বড় ঘটনা হয়ে উঠল। পদ্মপিসিকে নিয়ে বাবার সঙ্গে সুখেনের প্রথম প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। দ্বিতীয় সংঘর্ষ এলো এই খাতাটার সূত্র ধরে। বারাসাতের এক খুদে পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় সুখেন নিজে উদ্যোগী

হয়ে ছেপে দিল ঠাকুমার সেই সংক্ষিপ্ত এবং অসমাপ্ত আত্মচরিত। শুধু ঠাকুমাব নামটা বদলে প্রভাবতীর জায়গায় করে দিয়েছিল প্রভাময়ী। সেই পত্রিকা খুব স্বাভাবিকভাবেই পৌরপিতার হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। অমলেন্দু মুখার্জির বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি এই প্রভাময়ী কে এবং তিনি কোন পরিবাবের কাহিনী বলছেন।

মা জিজ্ঞেস করেছিল. 'খোকা তুই এ জিনিস কেন করলি ? তোব কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? ঘরের কথা হাটের মধ্যে টেনে আনলি।'

সুখেন থমথমে মুখে জবাব দিয়েছিল, 'রাগে আর ঘেন্নায। এই বাড়িটাকে আমি ঘেন্না করি।'

সুখেন আরও বলতে চেয়েছিল। তাব ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল, 'তোমরা যে উত্তরাধিকার আমাকে দিযেছো. আমি সেটাকেও ঘেন্না করি। ক্ষমতা থাকলে আমি বাপ-জ্যাঠাদের সব কীর্তি ফাঁস করে দিতাম।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে থামিয়ে দিয়েছিল সুখেন। মা'কে এসব কথা শুনিয়ে লাভ নেই। লিখতে পাবলে মা নিজেও ঠাকুমার চাইতে কম কিছু লিখতো না। কিন্তু মা কোনদিনই কিছু বলবে না। স্বামী দেবতাদের বিরুদ্ধে মায়ের মতো নারীরা কোনদিনই যুদ্ধ ঘোষণা করেনা। নারীকে সম্ভবত সেই কারণেই সহিষ্ণুতার আদর্শে দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

খেতে দিতে দিতে বড়মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর এত রাগ কেন ? বাপ-জ্যাঠারা তো তোর জন্যেই সব করছে। তুই বংশের একমাত্র ছেলে। ওরা কি ঘাটে যাবার সময় সব বোঁচকা বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?'

সুখেন খেতে খেতে জবাব দিয়েছিল, 'উপায় নেই তাই, থাকলে নির্ঘাৎ নিয়ে যেত।'

বড়মা ধমক দেওয়ার সুরে বলেছিল, 'তুই চুপ কর। গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে শেখ। শ্রদ্ধা না থাকলে কখনও বড় হতে পারবি না।'

সুখেন বড়মার মুখের দিকে এক পলকের জন্য তাকিয়ে থেকে পরে বলেছিল, 'আমি বাবা-জ্যাঠাদের মতো বড় হতে চাই না। শ্রদ্ধাতো শরীরের ঘামাচি নয় যে গরম পড়লে ফুটে বেরুবে। বাবা-জ্যাঠাদের কেউ শ্রদ্ধা করেনা, ভয় করে। সাপকে যেমন ভয় করে তেমনি। বারাসাতের কত লোকের সর্বনাশ এই বাড়ির পুরুষদের হাতে হয়েছে সেটা তুমি আমার চাইতে কিছু কম জান না।'

বড়মা উত্তেজিত চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি কি জানি আর না জানি সেটা তোর ভাববার দরকার নেই। তুই কেন বাড়ির নিয়ম মানবি না। তুই কেন এমন সৃষ্টিছাড়া হলি ?'

সুখেন ভাতের থালা থেকে উঠে পড়তে পড়তে জবাব দিল, 'তোমাদের বাইরে বেরুতে হয়না, আমাকে হয়। দশজন কী চোখে আমার গুরুজনদের দেখে সেটা আমি জানি। তাঁরা কী বলে আর কী ভাবে সেকথাও আমার অজানা নয়। এসব দেখে-শুনে রাগ হয়—শ্রদ্ধা হয়না।'

বড়মা রাগের চোখে সুখেনকে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'এই রাগ আর অশ্রদ্ধা তোকে নরকে নিয়ে যাবে। তুই ডুববি। এখনও নিজেকে শোধরাবার সময় আছে।'

সুখেন হাত ধুয়ে কুলকুচি করে মুখের জল ফেলে দিয়ে বলেছে, 'নরকে যেতে আমার আপত্তি শুধু একটাই, সেখানেও আমার গুরুজনদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তার চাইতে আমার বাপ-জ্যাঠাদের শোধরাতে বল।'

বড়মা চিৎকার করে উঠে বলেছিল, 'খোকা, পাপে তোর জিভ খসে যাবে।'

বড়মা কখনও সুখেনকে এত চড়া গলায় শাসন করেনি। আজ অন্যরকম হয়ে গেল। সুখেন নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখল, দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে বড়মা কাঁদছেন।

ট্রেনটা বিরাটি পেরিয়ে গেল। বারাসাতের আগের স্টেশন হৃদয়পুর। সেখানে নেমেই শ্রীপল্লীতে যেতে হবে। সুখেনের মনে হল, বড়মা আর মা'র কাছে গিয়ে কবিতার ব্যাপারটা একবার বলে আসবে কিনা। সে জানে, বুঝতে পারে, আজ না হোক কাল, কিংবা তারও পরে কোন একদিন বাবার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে। ভেতরে অন্ধ আক্রোশ মাথা কুটছে। ওরা কেউ জানে না, সুখেনের ভেতরটা কেমন ভাবে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। একবার জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, 'খোকাকে ইতিহাস পড়ানোই ভুল হয়েছে। ইতিহাস ওর মাথাটা খেয়েছে।'

জ্যাঠামশাইয়ের কথার মধ্যে অতীতের সেই সব জহ্লাদদের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যারা বইকে শত্রু ভেবে বই পোড়ানোর বহ্ন্যুৎসবে মেতেছিল। সেদিনের সেই অন্ধকার কি আজও থেকে গেছে পৃথিবীর মলিন বাতাসে। সুখেনের মাঝেমধ্যে বড় সাধ হয়, ক্রীতদাসের সেই যুগটাকে একবার দেখে। টি ভি তে ছবি দেখার মতো যদি একটিবার সে দেখতে পেত তাহলে মিলিয়ে নিতে পারত আজকে কতটা এগিয়েছে অথবা বদলেছে। বাইরে তো পরিবর্তনের মহা সমারোহ। সেটা চোখে দেখা যাচ্ছে। যেটা দেখা যাচ্ছে না। সেই ভিতরটা? মানুষের মন? সুখেন পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেনা। কিন্তু কখনও কখনও মনে হয় হয়তো পুনর্জন্ম সত্যি। হয়তো মীর্জাফর, উমিচাঁদ হিটলার আর চেঙ্গিসখান-নাদিরশাহের দলটা পৃথিবীর সব দেশে ভিন্ন নামে জন্মগ্রহণ করে

গেছে। গোয়েবল্‌সরাও জন্মাবার মাত্র চাকরী পেয়ে গেছে বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রচার দপ্তরে। ঘোরতর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। যে বাড়ির মাথায় শাদা নিশান ফাল্গুনের বাতাসে অভয়মন্ত্রের মতো উড়ছে, যে আকাশে পরম আহ্লাদে আজও সন্ধ্যায় মেঘের কোল ছুঁয়ে উড়ে গেছে শ্বেতশুভ্র পারাবতের দল সেই বাড়িরই কোন ঘরে তৈরি হয়ে চলেছে আরেকটা যুদ্ধের মারণাস্ত্র, সেই আকাশ দিয়েই আজ রাতে ইরাকী প্লেন উড়ে যাবে ইরানের দিকে অথবা ইরান থেকে উড়ে আসবে ইরাকের আকাশে। ভিয়েতনাম অথবা কামপুচিয়া বুকে রক্তের দাগ নিয়ে বসবে শান্তি আলোচনা নামক এক আন্তর্জাতিক সার্কাসের মঞ্চে। পুনর্জন্ম কি কেবল ওদেরই হয় যারা পৃথিবীর বাতাসে রক্তের গন্ধ মাখিয়ে দেয়, যাদের নখের নিচে লেগে থাকে মানুষের মাংস। তারাই চেহারা বদলে বার বার পৃথিবীতে জন্মায় কেন?

সুখেনের মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো তীরের মতো বিদ্ধ হতে থাকে। সে জানে, এইসব প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। তার নিজের মধ্যে দুঃখের গাঢ় ছায়া ছড়াতে থাকে। সুখেন জানেনা, কেন তার এমন হয়। কেন মনে হয় তার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে, বুকের অন্ধকারে নাম না জানা এক উত্তাল কষ্ট ক্রমাগত তাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে। বড়মা'র মতো সেও মনে মনে ভাবে, সে কেন তার বাবা-জ্যাঠাদের মতো হতে পারল না। কেন তারই বয়সী আর দশজন ছেলের মতো সে হতে পারছে না।

সুখেন সিগারেট বার করে ধরাল। আসবার সময় কবিতার দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা সে নিয়ে এসেছে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার মনে হল, প্যাকেটের গায়ে এখন আর কোন গন্ধ নেই। এখন তার গোটা চেতনা জুড়ে কবিতা ছড়িয়ে দিয়েছে ভিন্ন ধরনের একটা গন্ধ। যার চাপা অথচ তীব্র ঝাঁঝটা তাকে ভেতরে ভেতরে কষ্ট দিচ্ছে। ওর তেইশ বছরের সুঠাম যুবতী শরীর, যার অনেকখানি অংশই মধ্যরাতে অনাবৃত হয়ে থেকেছে সুখেনের সামনে, যার শরীরের স্পর্শ গোপনে জ্বলন্ত তুবড়ির মতো জ্বলে উঠে ছড়িয়ে গেছে তার সারা শরীরে এখন সেইসব কথা তার মনে এলো না। সেই অনুভবও আর সে খুঁজে পাচ্ছে না। তার চোখের সামনে ফ্রিজ হয়ে আছে সেই দৃশ্যটা—বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট আর ডান হাতে মদের গ্লাস নিয়ে কবিতা তাকিয়ে। চোখের দৃষ্টিতে শাণিতভাষা। একটু আগে সে চোখ ভাসিয়ে কেঁদেছিল। এখন কান্না নেই, সেখানে জ্বলে উঠেছে ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা। ভয়ঙ্কর সেই দৃষ্টির সামনে সুখেন বসে থাকতে পারছিল না।

কবিতা সিগারেট ফেলে দিয়ে মদের গ্লাসে চুমুক দিল। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে

বলল, 'প্যান্টের পকেটে তো একটা ফলকাটা ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াও। ওইটা দিয়ে মানুষের গলার শিরা কাটতে পারো?'

সুখেন হতাশ গলায় জবাব দিল, 'জানি না। কখনও চেষ্টা করে দেখিনি।' কবিতা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের গলায় বলল, 'এখনও চেষ্টা করোনি? তাহলে কেন ফিরে যাচ্ছো না বাপ-জ্যাঠাদের আশ্রয়ে। সেখানে তো সুখের অভাব নেই।'

সুখেন জবাব না দিয়ে উঠে এসেছে। বসবার ঘরে এলোমেলো পায়চারি করেছে খানিকক্ষণ। তারপর রাসেল স্ট্রীট থেকে ট্যাক্সি করে শিয়ালদায়। শিয়ালদা পর্যন্ত আসতে আসতে গোটা রাস্তা সে ভেবে গেছে, হয়তো নিয়তিই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। যুক্তি দিয়ে নিয়তির ব্যাখ্যা হয়না। কিন্তু তাব সঙ্গে কবিতার এমন করে দেখা হওয়াটাও তো ব্যাখ্যার অতীত। নিযতি ছাড়া এমন অঘটন আর কে ঘটাতে পারে।

হৃদয়পুর আসবার আগে সুখেন কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরল। মধ্যমগ্রাম থেকে কিছু লোক উঠল কামরায। সুখেন অনুমানে বুঝল এরা সবাই যাবে অশোকনগর। সেখানকার স্প্রিং মিলেব সকালের শিফটের কর্মী। কাগজটা মুখের সামনে তুলে রাখাই নিরাপদ। এবপরেই হৃদয়পুব এবং সেখানে নেমেই তাকে যেতে হবে শ্রীপল্লীতে। ব্যাপারটা সুখেনের পক্ষে বড় বকমেব একটা ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে সেটা সে জানে। তবুও কবিতাকে বলেছে, 'ভয় নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি ঠিক শ্রীপল্লীতে পৌঁছে যাব।'

রওনা হবার আগে দাড়ি কেটে পোশাক বদলাবার প্রস্তাবটা কবিতাই দিয়েছিল। বলেছিল, 'চেহারাটাকে কমন পিপলের মতো করতে পাবলে সুবিধে। তুমি পোশাকটা বদলে নাও।'

ওর মধ্যে তখনও নেশার ঘোরটা হয়তো থেকে গিয়েছিল। যদিও আচার-আচরণে তার কোন স্পষ্ট ছাপ ছিল না। মাতাল হবার পর থেকেই সুখেনকে সে 'তুমি' সম্বোধন কবতে আবম্ভ করে দিয়েছিল. নেশার দাপট কমে এলেও সম্বোধনটা আর 'আপনি'-তে ফিরে যায়নি। কারণটা সুখেনের কাছে দুর্বোধ্য। যদিও ব্যাপাবটা খুব তুচ্ছ। চিন্তিত হবার মতো কোন ব্যাপারই নয়। বরং কখনও কখনও ওর মুখ থেকে 'তুমি' সম্বোধন শুনতে সুখেনের ভালো লেগেছে। এ এক বিচিত্র ভালো লাগা। কবিতার মাতালশরীর যখন তাকে আঁকড়ে ধরে বাথরুম থেকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে আসছিল তখনকার সেই অস্বস্তিকর মুহূর্তের মধ্যেও জেগে ছিল এক বিচিত্র ভালোলাগা। কবিতা যখন কাঁদতে কাঁদতে দু হাতে মুখ ঢেকেছিল, তখন তার সেই দুঃখের মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল অন্যরকমের একটা আকর্ষণ। ওর উদ্ধত বুক, নিভাঁজ শরীর

আর কান্নার দমকে কেঁপে ওঠা বুক-পেটের দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে অন্যরকম একটা আকর্ষণ সে টের পেয়েছিল। তখন, ঠিক সময়েই তার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে উঠেছিল অন্ধ রাগ। সুখেন বুঝতে পারছিল সেই রাগ কবিতার চোখের জলের জন্য ততটা নয়, যতটা সেই নাম না জানা দুটি মানুষের জন্য যারা খানিক আগে এই ঘরে, এই শয্যাতে বসেই কবিতার এই শরীরটাব ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সুখেনের জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল সেই ঘনিষ্ঠতা কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু কবিতাকে সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারে। নিজের ওয়াড্রব থেকে যে পোশাক কবিতা নিয়ে এসেছিল আপাতত সেটাই এখন গায়ে। ওর ঘরে কি পুরুষ মানুষের পোশাকও থাকে ? এটা কার পোশাক ? নতুন নাকি কারো ব্যবহার কবা ? আর ভাববার সময় ছিল না। গাড়িটা হৃদয়পুর স্টেশনে ঢুকছে। সুখেন কাগজের আড়াল থেকে জানালা দিয়ে স্টেশনটাব দিকে তাকাল। প্ল্যাটফর্মটা জানালার পাশ দিয়ে পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে। গাড়িটার গতি কমে এসেছিল। এবার থামল।

॥ ৬ ॥

আকাশে সামান্য মেঘ জমেছিল। কিন্তু সেটা এমন নয় যে, এখনই বা খানিকবাদে বৃষ্টি নামতে পারে। এসময় একটু বৃষ্টি হলে সুখেনের সুবিধা হতো। বৃষ্টির অজুহাতে সে অনায়াসেই রিকশার সামনে প্ল্যাসটিকের পর্দা টেনে দিতে পারতো। কিন্তু বৃষ্টি না থাকলে তেমনটা করা যায় না। ট্রেন থেকে নেমে সুখেন সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলো না। প্ল্যাটফর্মের নিরালা একটা জায়গায় মুখেব সামনে কাগজ মেলে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেনটা চলে যাবার একটু পরেই গোটা প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। কলকাতা যাবার জন্যে জনাকয়েক লোক অন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। সুখেন স্টেশনের বাইবে এসে রিকশা নিল। দরদাম করাব সময় ছিল না। কিন্তু শ্রীপল্লীর নাম শুনেই রিকশাচালক বলল, 'পাঁচ টাকা লাগবে।'

সুখেন রিকশার মাথাব ওপরকাব ঢাকনি তুলে দিতে দিতে বলল, 'ঠিক আছে।'

সুখেন বুঝতে পারছে রিকশাচালক মনে মনে একটু অবাক হয়েছে। একটা স্টেশন এগিয়ে গিয়ে নামলে দেড় টাকা ভাড়াতেই শ্রীপল্লীতে পৌঁছে যাওয়া যেত। একটা স্টেশন পেছনে নেমে কোন বুদ্ধিমান পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়া গোনে না। টাকা এবং সময় দুটোই ফালতু খরচ হচ্ছে। সুখেন জানে,

রিকশাচালক এরকম কিছু ভাবলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। সুখেনকে সে চেনে না, সুখেন কেন বেশি ভাড়া দিয়ে বেশি সময় খরচ করে শ্রীপল্লীতে যাচ্ছে সেটা তার জানার কথা নয়। কথাটা যত কম লোকে জানে ততই সুখেনের পক্ষে ভাল।

খুব সাধারণ চেহারার একটা বাড়ি। আগে বোধহয় দরমার বেড়া ছিল। খুব সম্প্রতি ইঁটের গাঁথনি দেওয়া হয়েছে। বাড়ির কাজ হয়তো এখনও চলছে খুব ধীর গতিতে। উঠোনে কয়েকটা নতুন ইটের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা আছে কিছু বালি। মশলা মাখাবার জন্যে উঠোনের মধ্যেই যে ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল সেটার চেহারা রীতিমতো টাটকা। সামান্য কিছু নতুন ইট উঠোনের একপাশে পাঁজা করে রাখা আছে। এত সকালে এই বাড়ির কেউ বোধহয় কোন আগন্তুককে আশা করেনি। মেরুনরঙের ফ্রক পরে একটি মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল। বছর দশেক বয়স হতে পারে কিংবা তার চাইতে কিঞ্চিৎ বেশি। ঠোঁটের দু দিকে সাদা ফেনা। মেয়েটি সুখেনকে দেখেই ঘরে চলে গেল। তারপরেই ডোরাকাটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়। মেয়েটি এখন তার পেছনে। কবিতা নিজের বাড়ি আর বাড়ির লোকদের সম্পর্কে এত বিশদভাবে সুখেনকে বলে দিয়েছিল যে সুখেন বুঝতে পারল লুঙ্গি পরা প্রৌঢ় লোকটি কবিতার বাবা। তার পেছনে হাতে দাঁত মাজার ব্রাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতারই ছোট বোন নমিতা। বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ওপরে শুয়ে আছে পাটকিলে রঙের একটা কুকুর। কবিতা কুকুরটার নামও বলে দিয়েছে। কবিতার বাবা অর্থাৎ অবনীকান্ত বসুর চোখে প্রথমে ফুটে উঠল নীরব জিজ্ঞাসা এবং কাছে এসে সুখেনের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা অবিশ্বাস আর অনেকখানি বিস্ময়ে তিনি ঝট করে বাঁ হাতে রাখা চশমাটা চোখে তুলে নিয়ে অস্ফুটে বললেন, 'তুমি, মানে আপনি সুখেন মুখার্জি। মানে চেয়ারম্যানের ছেলে না?

সুখেন নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, প্রৌঢ়ের অনুমান যথার্থ।

অবনীবাবুর গলায় এবার কিছুটা বিস্ময় এবং অনেকটা ভয় প্রকট হয়ে উঠল, 'এখানে কেন? আমি সাধারণ গরীব মানুষ। আমাকে বিপদে...

সুখেন অবনীবাবুকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ঘরে চলুন, কথা আছে।'

অবনীবাবু নড়ছেন না। নমিতা বিস্ফারিত চোখে দৃশ্যটা দেখছে। কবিতার মা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এমনভাবে যেন দ্বাররক্ষীর চাইতেও কঠিন দায়িত্ব এখন তার ওপর যাতে হুট করে সুখেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারে।

সুখেন ওদের তিনজনকে দেখে নিয়ে বলল, 'ভয় নেই। আমি কবিতার কাছ

থেকে আসছি। আমাব হাত দিয়ে কবিতা টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনার তো আগামীকাল যাওযার কথা ছিল, তার আব দবকাব নেই।'

অবনীবসু সুখেনের মুখেব দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

সুখেনকে নিয়ে অবনীবাবু ভেতরে আসছেন দেখে দরজায় দাড়ানো মহিলা, যিনি কবিতাব মা, তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে যেতে যেতে ডাকলেন, 'নমি, এ্যাই নমি।'

সুখেন ঘরে ঢুকে টের পেল রাতেব বিছানা, মশাবী তখনও গোছগাছ কবা হযনি। মা-মেযে যতটা সম্ভব গুছিয়ে দিচ্ছে তখনও। বাবান্দা থেকে চেয়ারটা টেনে আনল নমিতাই। সুখেন বসল সেই চেযারে। এই একটা ঘরই বোধহয় নতুন করে তৈরি করাব পব আপাতত বাসযোগ্য কবা হযেছে। ঘবেব মধ্যে বিস্তব জিনিসপত্র ঠাসাঠাসি কবে রাখা। পুরনো শাড়ির কাপড় দিয়ে মুড়ে লেপ রাখা হয়েছে উঁচু তাকের ওপর। কিছু পেতলেব বাসনপত্র আর পুরনো বই। তাকের সামনে একটা দড়ি দেখে সুখেন অনুমান কবল ওখানে পদা টানিযে একটা আড়াল দেবার পবিকল্পনা রয়েছে।

সুখেন চেয়ারে বসবার আগে পকেট থেকে সাদা রঙেব, একটা খাম বাব করে অবনীবাবুব হাতে দিল। কবিতা ওই খামের মধ্যে টাকা পাঠিযেছে। কত টাকা পাঠিযেছে সেটা সুখেন জানে না। খামটা যেমন দিয়েছিল তেমনই সে পকেটে রেখে দিয়েছে। তবে স্বাভাবিক ভাবে অনুমান করা যায়, অন্যান্যবার যা পাঠিয়ে থাকে এবাব তাব চাইতে কিছু কম হতে পারে। কেননা, কবিতার কাছ থেকে সুখেনকেও পথ খবচেব জন্য টাকা নিতে হযেছে। টাকার দরকার ছিল এটা খুবই বাস্তব ঘটনা। বাসেল স্ট্রীটেব ফ্ল্যাট বাড়িতে সে যখন যায় তখন তার পকেটে পুঁজি মাত্র দু' টাকা। সে জানতো ওই পুঁজি নিয়ে পালিযে বেড়ানো তাব পক্ষে সম্ভব নয়। তবু কবিতার কাছে মুখ ফুটে সে চাইতে পাবেনি। এক রাত্রির আকস্মিক পরিচয়ে পবপর এমন সব ঘটনা ঘটে যেতে লাগল যাতে ওদের মধ্যেকার দূরত্ব অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তবুও টাকা চাইবার মতো পরিস্থিতি আসেনি। কবিতাব মুখ থেকে অনেক ঘটনা শোনাব পর, সে বাবাসাতেব শ্রীপল্লীব মেয়ে জানার পরেও টাকার ব্যাপারে তার সঙ্কোচ থেকে গিয়েছিল। টাকাটা কবিতা নিজে থেকেই সুখেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'জেল পলাতক আসামীর কাছে টাকা থাকবার কথা নয়, যদি না ইতিমধ্যে চুরি-ডাকাতি করে থাকে। তাই এ টাকাকটা সঙ্গে রাখো। ইচ্ছেমতো পালাতে সুবিধে হবে।'

কবিতার হাতে কুড়ি টাকার কযেকটা নোট। টাকার পরিমাণটা কত সেটা

সুখেন জানে না। হাত বাড়াবার আগে বলল, 'আপনার সঙ্গে হয়তো আব দেখা নাও হতে পাবে। যদি তাই হয় তাহলে টাকাটা শোধ দেব কেমন করে ?'

কবিতা চোখ বুজিয়ে ফেলে হেসেছিল। যেমন হাসি ওই মুখে মানায়, যেমন দৃষ্টি ওই চোখের তারায় দেখতে পেলে ভাল লাগে অবিকল সেই রকম করে কবিতা তাকিয়েছিল তার দিকে। তারপব শূন্য প্রান্তরে হু হু কবে বয়ে যাওয়া উদাসী বাতাসেব মতো শব্দ কবে শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'নাই বা শোধ দিলে। তবুও যদি ঋণের দায়ে আবার কোনদিন এসে যাও। না এলে না হয় ঋণীই থেকে যাবে।'

কবিতা যেন কঠিন রহস্যে মোড়া এক নারী। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওকে নানাভাবে দেখে-দেখেও বোঝা যাচ্ছে না সুখেনেব প্রতি ওর সত্যিকারের মনোভাবটা কী এবং কেমন। ওর জীবনচরিতে, ভাগ্যে অথবা দুর্ভাগ্যে সুখেনের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই। তবে সুখেনের বাবার আছে। মাননীয় পৌরপিতা অমলেন্দু মুখার্জির ছেলে বলেই কি কবিতা তাকে বিশেষ নজরে দেখছে। কিন্তু সেই নজরটা তো এমন হওয়াব কথা নয়। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাওয়ার পর সে যা করেছে অথবা বলেছে সেটা বিবেচনায় আনছে না সুখেন। কিন্তু এখন তো নেশা কমে এসেছে। ওর কথায়, আচবণে কোন মাতলামীর চিহ্ন নেই। তবুও কেন কবিতা এমন করছে যাতে সুখেনের মনে হচ্ছে সে যেন অনেককাল ধরে সুখেনকে চেনে, জানে এবং মিশছে। যতটুকু চেনে সে তো অমলেন্দু মুখার্জির ছেলে বলে। যতটুকু দেখেছে সে তো দূব থেকে।

টাকাটার প্রয়োজন ছিল। সুখেন হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো পকেটে রাখতে রাখতে বলেছিল, 'আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আপনাকে আমার মনে থাকবে।'

কবিতা শব্দ না করে হাসল। সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমারও মনে থাকবে। তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে।'

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে সুখেন জিজ্ঞেস করল, 'অন্য কারণটা কী ?'

কবিতা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'সেটাও জানতে চাও ?'

সুখেন উত্তর দিল, 'সবই যখন জানিয়েছেন তখন এটাই বা কেন বাকি থাকে।'

কবিতা সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। জানালার দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'তোমার জেঠিমা তোমাদের বাড়িতে একদিন আমাকে দেখে বলেছিলেন তোমরা যদি বামুন হতে তাহলে তোমাকে আমি সুখেনের বৌ করে ঘরে আনতাম। এবাড়ির ছেলেরা কায়েত বিয়ে করবে না।'

তখনই চমকে উঠে সুখেন তাকিয়েছিল কবিতার দিকে। কবিতা জানালার ভেতব দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে তখন শেষ রাতের অন্ধকার। সুখেনেব মনে পড়ে গেল, বড়মা একদিন বলেছিলেন বটে, শ্রীপল্লীর একটা রিফিউজি মেয়ে ঠাকুরপোর কাছে চাকরীর জন্যে এসেছিল। মাঝে-মাঝেই নাকি আসে। মেয়েটা দেখতে ভারি ভাল। যদি কায়েতের ঘবের মেয়ে না হতো তাহলে তোব সঙ্গে বিয়ে দিতুম। ঘর আলো করা বৌ হতো।

সেই মেয়েকে দেখবার একটা তাৎক্ষণিক কৌতূহল তখন সুখেনের হয়েছিল। কিন্তু তিনদিনেব ছুটি কাটিয়ে কলকাতাব মেসে যাবার পব আর তার কথা মনে থাকেনি। কলেজেব পডা আর ছাত্র ইউনিয়নের কাজে সব ভুলে গিয়েছিল।

কবিতার ফ্ল্যাটের দরজা থেকে লিফট মাত্র কয়েক হাত দূরে। দরজা থেকে লিফট দেখা যায়। দবকাব ছিলনা, তবু কবিতা এসেছিল লিফট পর্যন্ত। দরজা থেকে বেরুবাব সময় বলেছিল, 'তোমার পক্ষে বারাসাত এখন নিরাপদ নয়। তবুও তোমাকে যেতে হচ্ছে আমাবই জন্যে। ভেবে দেখ, না গেলেও কিন্তু চলবে।'

সুখেন মাথার চুল পবিপাটি করতে করতে বলেছিল, 'নাহয় আপনার জন্য একটু ঝুঁকি নিলাম। আপনিও তো আমার জন্যে নিয়েছিলেন।'

কিন্তু সুখেন জানতো, তাকে আজ কিংবা কাল অথবা পরশু একবার বারাসাতে যেতেই হবে। বাবার মুখোমুখি দাঁড়ানোটা অত্যন্ত জরুরী। লিফটের দরজা খুলে যাওয়ার পর ভেতরে ঢুকে সুখেন সামনে তাকিয়ে দেখল কবিতা দাঁড়িয়ে আছে। স্বয়ংক্রিয় দরজাটা আপনা থেকেই ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছিল। সুখেন হঠাৎ বলে ফেলল, 'একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। বাবা-জ্যাঠাদের মতো আমি বামুন-কায়েতের ভেদাভেদ মানি না—কোনদিনও মানতাম না।'

পুরো কথাটা শেষ করবার আগেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুখেন আর কিছু দেখতে পায়নি। শুধু বুঝতে পেরেছে সে নিচে নেমে আসছে। লাল আলোর অঙ্কসংকেত তাকে জানিয়ে দিচ্ছিল সে কতটা নিচে নেমে এসেছে।

অবনীবাবু টাকাটা গোনবার আগে মেয়ের চিঠি পড়লেন। চিঠিপড়া শেষ করে সুখেনের দিকে বোবা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এখান থেকে কোথায় যাবে কিছু ভেবেছো?'

সুখেন উত্তর দিল, 'এখনও ঠিক করিনি। ভাবছি একবার মা আর বড়মাকে দেখতে বাড়ি যাবো। যদি আর কোনদিন ফিরে আসতে না পারি।'

নমিতা চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে এলো। ঘরের মধ্যে কোন টেবিল ছিল না। অবনীবাবু আরেকটা চেয়ার টেনে এনে সামনে রাখলেন। নমিতা তার ওপর চায়ের কাপ রাখল। অন্য প্লেটে খানকয়েক থিন অ্যারারুট বিস্কুট।

চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে অবনীবাবু বললেন, 'দীনবন্ধু সাহা লোকটা খুবই খারাপ আর বদ প্রকৃতির ছিল সন্দেহ নেই। ওর মৃত্যু অনেক গরীব লোকের স্বস্তির কারণ হয়েছে। কিন্তু তুমি লেখাপড়া শিখে শেষে খুন করবে এটা মানে তোমাকে কিছুটা চিনতাম বলেই অবাক লাগছে। খুনোখুনি ব্যাপারটা ·'

সুখেন স্থিরচোখে অবনীবাবুর দিকে তাকাল। অবনীবাবু কথা থামিয়ে দিয়ে খুকখুক করে একটু কাশলেন। সুখেন বলল, 'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন খুনোখুনি ব্যাপারটা আমার মতো শিক্ষিত ভদ্রলোককে মানায় না—তাই না ?'

নিজেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন অবনীবাবু। এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক তাই।'

সুখেন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, 'পৃথিবী জুড়ে দুটো বিশ্বযুদ্ধ যাঁরা বাঁধিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই শিক্ষিত এবং তথাকথিত ভদ্রলোক। এখনও এদেশে সবচেয়ে বড় খুনগুলো যারা ঘটায় তারা শিক্ষিত আর ভদ্রলোকের বাচ্চারাই। সবাই যাকে জানে খারাপ লোক বলে সেই লোকটা কেন এতদিন অন্যায় করেও শাস্তি ভোগ করেনি সেই প্রশ্নটা তো আপনারা কেউ কোনদিন তোলেননি।'

অবনীবাবু ঢোক গিলে বললেন, 'কে তুলবে ? সবাই তো ভয়ে ভয়ে থাকতো।'

আমরা ভয় করতুম। ওদের হাতে টাকা, ওদের হাতে ক্ষমতা। ওরা কী না পারে। তাছাড়া—

অবনীবাবু থেমে গেলেন। সুখেনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। সুখেন বলল, 'থামলেন কেন ?'

অবনীবাবু বললেন, 'না, মানে, তুমি কিছু মনে করো না। তোমার বাবা-জ্যাঠাদের প্রতাপ তো জানো। দীনবন্ধু ছিলো ওঁদেরও স্নেহের লোক। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আর্থিক তিনরকম ক্ষমতাই তো ওঁদের আছে। ওদের সঙ্গে কে টক্কর দিতে গিয়ে বিপাকে পড়বে।'

সুখেন জানতো দীনবন্ধু তার পিতৃবন্ধু। দীনবন্ধুর ছিল মাছের ভেড়ি, চালের গুদাম, ইটখোলা আর চাপাডালির মোড়ে মস্তবড় বাজার। বাবা-জ্যাঠাদের স্নেহ পাবার যোগ্যতা তার ছিল। সুখেন জানে এই শহরে তার বাবা-জ্যাঠাদের নিজস্ব

একটা গোষ্ঠী আছে। সেই গোষ্ঠীর হাতেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নানা ক্ষমতা দেওয়া আছে। যেন মোঘল রাজত্বের সুবেদারদের মতো। সুখেন অবাক হয়ে মাঝে-মধ্যে ভাবে, অন্যের অনিষ্ট এবং সর্বনাশের মধ্যে দিয়ে যাদের সমৃদ্ধি আসে গোটা জগৎ জুড়ে সেই সব মানুষরাই নিজেদের স্বার্থের তাগিদে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বার্থরক্ষা করে যায়। অথচ যারা তাদের শিকার তারা কখনও টের পায় না তারা কি ভীষণ একা এবং নিঃসঙ্গ। পরস্পরের সঙ্গে তাদের কোন আত্মিক যোগ নেই। যেন সজনে গাছে চাক বেঁধে থাকা শুঁয়োপোকার মতো। নিচে থেকে কেউ আগুন দিলে যাদের গায়ে আগুন লাগে তারা টপটপ করে খসে পড়ে নিচে, বাকিরা তখনও গাছ আঁকড়ে থেকে যায়, ভাবে আগুনের আঁচ থেকে তারা বুঝি বেঁচে যাচ্ছে। সুখেন সেই লক্ষ লক্ষ শুঁয়োপোকার মতো হয়ে বাঁচতে চায় না।

কাপের চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এক চুমুকে সেটা শেষ করে সুখেন বলল, 'দীনবন্ধু সাহার মৃত্যুতে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে ওকে আমি খুন করিনি। ও যে খুন হবে সেটাও আমি জানতাম না।'

অবনীবাবু অবাক চোখে সুখেনকে দেখতে দেখতে বলল, 'তাহলে সবাই যে বলে তুমিই ওকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে?'

সুখেন মনে মনে ভাবছিল এখানে সিগারেট ধরানো উচিত হবে কিনা। অবনীবাবু অবশ্য চার্মস্-এর প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে আনছেন। অবনীবাবু নিজে সিগারেট মুখে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সিগারেট খাও? খাবে?'

সুখেন ঘাড় নাড়ল। অবনীবাবু আরেকটা সিগারেট প্যাকেট থেকে বার করে সুখেনের দিকে বাড়িয়ে দিল। সুখেন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'ঠিকই বলে। আমি ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কেননা বাবার নাম করে অত রাত্রে ডাকলে ওকে আসতেই হবে এটা আমার জানা ছিল। লোকটাকে হাত-পা ভেঙ্গে কিছুদিন হাসপাতালে রাখার ইচ্ছা হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু যারা ওকে মেরেছিল তারা ভাবেনি অত অল্প মারেই লোকটা মরে যাবে।'

অবনীবাবু হঠাৎ জিগ্যেস করে ফেললেন, তারা কারা? সুখেনের দৃষ্টি কঠোর হয়ে গেল। গলার স্বর বদলে সে জবাব দিল, 'তাতে আপনার কোন প্রয়োজন নেই।'

অবনীবাবু মলিন মুখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল ভয় আর উদ্বেগ। সুখেন সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'আমি এখনই চলে যাবো। আমি যে এখানে এসেছিলাম কিংবা কবিতার সঙ্গে কলকাতায়

আমার যোগাযোগ হয়েছে একথাটা আপনারাও ভুলে যাবেন।'

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবে ?'

সুখেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'এখনও জানি না।'

অবনীবাবু বললেন, 'তুমি বর্ডার পার হয়ে বাংলাদেশে চলে যাও। চোরাপথে পার করে দেবার অনেক লোক আছে।

সুখেন সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'আমি জানি। কিন্তু পালিয়ে দেশের বাইরে যেতে চাই না।'

সুখেন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। দরজা পেরিয়ে নেমে এলো উঠোনে। বাইরে ততক্ষণে রোদের তেজ বেড়ে গেছে। সকাল বেলায় সে যখন রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে এসেছিল তখনও কলকাতার গায়ে জড়িয়ে ছিল অন্ধকার। স্টেশন থেকে যখন গাড়ি ছাড়ল তখন জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখেছিল কিশোরীর নরম চোখের দৃষ্টির মতো আলো ফুটছে আকাশের গায়ে। এখন সেই আলো অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ। অবনীবাবু পেছন-পেছন নেমে এসেছেন। সুখেন এগিয়ে যেতে যেতে অবনীবাবুকে দেখল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কবিতা, মানে আপনার মেয়ে আসলে কী চাকরী করে সেটা আপনি জানেন ?'

অবনীবাবু উত্তর দেবার আগে পেছন দিকে তাকালেন। তারপর ফ্যাকাশে মুখ তুলে সুখেনের দিকে এক পলকের জন্যে তাকিয়ে মাথা নিচু করে জবাব দিলেন, 'জানি'।

সুখেনের শরীর জ্বলে উঠল। তার মনে হল, এই লোকটাও মহা বজ্জাত। জেনে শুনে নিজের সুন্দরী মেয়েকে বাঁধা রেখেছে সুরেশ মালহোত্রার কাছে। মাসে মাসে টাকা পেয়ে যাচ্ছে বলে সব নিঃশব্দে মেনে নিচ্ছে। বেঁচে থাকার এই কি একমাত্র পথ ? সবাই কি একই ভাবে বেঁচে আছে ?

সুখেন ঘৃণার দৃষ্টিতে অবনীবাবুর দিকে তাকালো। তার মনে হচ্ছিল এই প্রৌঢ় লোকটার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয় কিংবা দু' হাতে গলা টিপে ধরে বলে, 'আপনার লজ্জা করে না ? তার চাইতে রেলস্টেশনে বসে লজেন্স বিক্রি করুন। কিন্তু সুখেন তেমন কিছুই বলতে পারল না। শুধু অস্ফুটে বলল, 'জানেন, কতখানি জানেন ?

অবনীবাবু পরাজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, সবটাই জানি। কিন্তু দোহাই আপনাকে, কথাটা আর কাউকে বলবেন না। ওর মা, বোন আর ছোটভাই এসব জানে না। ওরা জানে, দিদি ইউনাইটেড শিপিং করপোরেশনের অফিসে স্টেনোর চাকরী করে। সকাল ন'টায় অফিস। যাতায়াতের কষ্ট বলে কোম্পানির দেওয়া

ফ্ল্যাটে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে থাকে।'

অবনীবাবু ম্লান দৃষ্টিতে সুখেনের মুখের দিকে তাকালেন। তার চোখে-মুখে গভীর আর্তি। সুখেন কঠিন চোখে অবনীবাবুকে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনাব লজ্জা হওয়া উচিত। মেয়েটাকে আপনি নষ্ট হতে দিয়েছেন। ওর রোজগাব খেতে আপনাব বিবেকে বাধে না?'

আহত দৃষ্টিতে অবনীবাবু প্রথমে সুখেনের মুখের দিকে তাকালেন পরে দৃষ্টিটাকে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন। বিবেকটাও তো বাঁধা দেওয়া আছে। ওর বোজগারেই ছোট মেয়েটার বিয়ে দিতে চাই। ওর সুপারিশেই ছেলেটার একটা চাকরী চাই, ওর টাকাতেই এই পাকা বাড়িটা তুলতে চাই। এতগুলো চাওয়াব জন্য কিছু তো ছাড়তেই হবে।'

সুখেনের মাথার মধ্যে বক্ত পাক খেয়ে উঠল। সে চলতে চলতে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল এই নির্বিবেক নির্লজ্জ প্রৌঢ়টিকে আঘাত করবার জন্যে । রাগ মাথায় উঠে গেলে তাব সব গোলমাল হয়ে যায়। সে হয়তো একটা চড় কিংবা ঘুষি মেবে বসতো অবনীবাবুর মুখের ওপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্রি ব্যাপারটা ঘটতে পারল না। সুখেনকে অমন করে ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই অবনীবাবু বলে উঠলেন, 'চেযাবম্যান সাহেবের দয়া যে ওকে শেষ পর্যন্ত ওখানে নিয়ে যাবে সেটা আমরা ভাবিনি, বুঝিনি। যখন বুঝলাম, তখন পিছু ফেরার উপায় নেই। বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স ততদিনে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।'

অবনীবাবু যেন জোঁকের মুখে নুন ছিটিয়ে দিলেন। সুখেন দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে থামিয়ে বাখল। থমথমে গলায় প্রশ্ন কবল, 'সুরেশ মালহোত্রা লোকটা কেমন? কোথায থাকে?'

অবনীবাবু উত্তর দিলেন, 'তাঁকে কখনও চোখে দেখিনি। শুনেছি তিনি আজ কলকাতায়, কাল দিল্লি, পবশু বোমবাই। এ হপ্তায় ভারতে তো পরের হপ্তায় নিউইয়র্কে। কথাবার্তা যা হবার তা হয়েছে ওঁর অফিস সেক্রেটারি শ্রীবাস্তবের সঙ্গে।'

কবিতার কথার সঙ্গে গোটাটাই মিলে যাচ্ছে। গত কয়েকবছরে সুরেশ মালহোত্রাকে কবিতা সামনাসামনি দেখেছে মাত্র তিনবার। রাসেল স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে তিনি একদিনের জন্যেও আসেননি। কবিতা নিজের প্রয়োজনে শ্রীবাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অধিকাংশ সময়েই সেটা ঘটে টেলিফোনে। যে তিনবার সুরেশ মালহোত্রাকে কবিতা দেখেছিল তার মধ্যে দু'বার কথা বলবার কোন সুযোগই হয়নি। গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুমে একটা পার্টিতে দূর থেকে

দেখেছিল মাত্র। কবিতা তখনও রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে উঠে আসেনি। ওকে তখন মিসেস দস্তুর আর পামেলা দত্তের অধীনে ট্রেনিং নিতে হচ্ছে। স্টেনো কাম রিসেপশনিস্টকে কেমন হতে হয় তারই ট্রেনিং। কেমন করে সাজতে হয়, কেমন পোশাক পরে কেমনভাবে কথা বলতে হয় তারই হাতে কলমে শিক্ষা চলছে। মালহোত্রা পার্টিতে ছিলেন বোধ হয় পনেরো মিনিট। একটা আপেল জুসের গ্লাস নিয়ে বার দুই চুমুক দিয়ে ওয়েটারের হাতে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার তাকে দেখেছিল রেসকোর্সের মাঠে। কালো চশমা পরে তিনি বসেছিলেন সাদা রঙের একটা চেয়ারে। তৃতীয়বার দেখা হল কলকাতার অফিসে। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তাকে যেতে হয়েছিল মালহোত্রার অফিস ঘরে। বিশাল ঘর। পেছনে রঙিন একটা ম্যাপ। অন্য দিকে সমুদ্রের ওপর ভাসমান একটি জাহাজের ছবি। তারই পাশে চা বাগিচার রঙিন আলোকচিত্র। টেলিফোনে কথা বলতে বলতে একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিক সেই তাকানো। মাত্র কয়েক মিনিট তার সামনে কবিতা বসেছিল। ঠান্ডা ঘরের মধ্যে চাপা একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শ্রীবাস্তব বিনীতভাবে কবিতার পরিচয় দিয়ে বলল, 'শি কামস ফ্রম রিমোট ভিলেজ। সো—....

টেলিফোন বেজে উঠতেই শ্রীবাস্তব থেমে গেল। মালহোত্রা সংক্ষেপে কথা শেষ করে টেলিফোন রাখতেই শ্রীবাস্তব বলল, 'রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা—' মালহোত্রা চোখ থেকে চশমা খুলে কবিতার দিকে একবার তাকালেন। সৌজন্যবশত কাউকে হ্যালো বলার সময় মুখে যতটুকু হাসি ফোটে, মালহোত্রার মুখেও ঠিক ততটুকু হাসি ফুটল। কবিতার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শ্রীবাস্তবের দিকে তাকালেন। মুখে তখনও সেই মাপা হাসি। মালহোত্রা বললেন, 'ও· কে, আপনি সব অ্যারেঞ্জ করে দিন।'

শ্রীবাস্তব থেকে চোখ সরে এলো কবিতার দিকে। প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোত্থেকে আসেন ?'

কবিতা নিচু গলায় উত্তর দিল, বারাসাত।'

মালহোত্রা অবাক হবার ভঙ্গিতে বললেন, 'ও মাই গড ! ইট ইজ নিয়ারার টু বাংলাদেশ বর্ডার। ইউ কাম বাই ট্রেন ?

কবিতা উত্তর দিল, ইয়েস স্যার।'

মালহোত্রা আরও অবাক হবার ভঙ্গি করে বললেন, আই নো, লোক্যাল ট্রেন জার্নি ইজ এ হরিবল এক্সপেরিয়েন্স।'

কবিতার মুখ থেকে দৃষ্টি তুলে শ্রীবাস্তবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইউ প্লিজ অ্যারেঞ্জ সামথিং ফর দিস লেডি। বারাসাত ইজ ফার ফ্রম ক্যালকাটা।'

শ্রীবাস্তবের চোখ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে কবিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কলকাতায় শিফট করে আসুন। কবিতা সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছিল মালহোত্রা অত্যন্ত পরিপাটি মানুষ। তাব অফিসঘরটির মতো তাঁর চেহারাও ঝকঝকে এবং আকর্ষক। যে সব পুরুষ মানুষদেব চেহারা দেখে বয়স অনুমান কবা যায় না মালহোত্রা ঠিক সেই জাতের পুরুষ। কবিতা আরও বুঝেছিল যে, মেয়েদের প্রতি তার সহানুভূতি আছে কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি কোনও আগ্রহ নেই। কথা শেষ হয়ে যাবার পর মালহোত্রা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীবাস্তবেব সঙ্গে কবিতাও বেবিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। এই সাক্ষাৎকারের পনেরোদিন পরেই কবিতা উঠে আসে রাসেল স্ট্রীটের সেই ফ্ল্যাটে।

সুখেন রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। অবনীবাবু খানিকটা এসে ফিরে গেছেন নিজের ঘরে। কবিতা নিজেব শরীরটার সঙ্গে মনটাকেও উন্মুক্ত করে ফেলেছিল। সুখেন যতটুকু জানতে চেয়েছিল তাব চাইতে অনেক বেশি সে জানিয়ে দিয়েছে। এতটা না জানালেও চলতো। এতখানি জানিয়েছিল বলেই সুখেনের মধ্যে জ্বালাটা কিছুতেই কমছে না। যেন একটা তপ্ত ক্ষ্যাপা বাতাস সুখেনের বুকেব মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কবিতা। সেই বাতাস তাকে ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে বারাসাতেব বাড়িতে।

সুখেনের অবাক লেগেছিল তখন, যখন সে বুঝতে পারল, সে না চিনলেও কবিতা তাকে চেনে। চিনেছে। যদি চিনেই থাকে তাহলে প্রথমে কেন বলেনি সেই কথা?

কবিতা উত্তব দেবার আগে নিজের চুলেব বেণীটাকে বুকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে পেছনে ফেলে দিয়ে বলল, দেখা মাত্রই চিনেছিলাম সেটা ঠিক নয়। চিনেছি কিছু পরে আস্তে আস্তে। ভেবেছিলাম, না চেনার ভান করে তোমাকে তাড়িয়ে দিলে আমার কথাটা বারাসাতের আর কেউ জানবে না। পবে যখন বুঝলাম, তুমিও বারাসাত থেকে পালাতে চাও, তোমার পেছনেও রয়েছে ভয় তখন ভেবে দেখলাম, তোমাতে আমাতে তফাৎ খুব সামান্য। তাই....'

কবিতা থেমে গিয়ে জোবে করে শ্বাস নিল। ওর নাকটা ফুলে রইল কিছুক্ষণ।

শেষরাতের স্তিমিত অন্ধকারে মাতাল এক যুবতী যা বলেছিল সেই কথাটার তাৎপর্য এখন শ্রীপল্লীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকালের উজ্জ্বল আলোতে সুখেনের চেতনায় ধাক্কা দিল। জেলের গরাদ আর বন্ধন তার ভাল লাগেনি। সে বাইরে আসতে চেয়েছিল মুক্তির স্বাদ পেতে। কিন্তু এখানে মুক্তি কোথায়? কবিতার

চারপাশেও তো মানুষের তৈরি জেলের গরাদ। কবিতা তার থেকে পালাতে পারছে না। একটা অদৃশ্য কারাগারে তারই মতো আটকে আছে একটি মেয়ে। মেয়েটির জন্যই ভয়, সংস্কাব আর বেঁচে থাকার ভবিষ্যৎ ভাবনায় ঝড়ের মুখে পড়া পাখির মতো টিকে থাকছে অবনী বসু নামক এক প্রৌঢ় ও তার পরিবার। ওরাও দেখতে পাচ্ছে না, ওদের চারপাশে ক্রমে ক্রমে তৈরি হয়ে গেছে গরাদ—যা চোখে দেখা যায় না। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না কিন্তু অনুভবে বন্দী থাকার যন্ত্রণাটা টের পাওয়া যায়। এরা কি সেটা টের পায় ?

সুখেন বড় বাস্তায় এসে দাঁড়াল। সে জানে তাব চার পাশে বিপদের ছায়া। কিন্তু আপাতত সেই ছায়াকে অগ্রাহ্য করতে হচ্ছে। বেপরোয়া হতে না পারলে সে টিকে থাকতে পারবে না। এখন কিছু দিন তাকে এইখানেই টিকে থাকতে হবে। অন্য কিছু নয়। শুধু বাবার মুখোমুখি হবার জন্য তাব একবার বারাসাতের বাড়িতে যাওয়া দবকার। যে তপ্ত খ্যাপা বাতাসটা তার বুকের মধ্যে আগুনের ঝড় তুলেছে সেটাকে থামাতে না পারলে তার শান্তি নেই।

সুখেন দেখল একটা খালি অটো শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে। সুখেন হাতের ইশারায় অটো চালককে ডাকল। অটোতে উঠে বসতে যাচ্ছে এমন সময় চালক বলে উঠল, 'আরে সুখেন দা যে ! কবে এলেন ? সুখেন অটোতে ওঠবার আগে ছেলেটার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, 'তুই শিবু না ? তোর দাদা কোথায়—মণ্টু ? শিবু বলল, 'দাদা বাড়িতে আসে না। বনগাঁতে আছে '

অটোতে উঠতে উঠতে সুখেন বলল, 'বনগাঁর কোথায় ? আমার খুব দরকার। যদি জানিস সত্যি বল।'

শিবু বলল, 'সাতভাই কালীতলায়। যাবেন ? সুখেন উত্তর দিল 'চল।'

শিবু অটোতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ির গতি বাড়াতে লাগল। ঝড়ের মতো গতিতে চলতে লাগল অটো গাড়িটা।

॥ ৭ ॥

কলকাতার থেকে রাত করে বাড়ি ফিরে এলো অমলেন্দু। সুখেনের মা সুষমা বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে বুঝে গিয়েছিল স্বামী ফিরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে যখন অমলেন্দু ওপরে উঠে আসছিল তখন ঠিক বোঝা যায়নি, বুঝতে পারেনি সুষমা। এখন বারান্দার পরিপূর্ণ আলোয় স্বামীর থমথমে মুখ দেখে তার বুক কাঁপতে লাগল। স্বামীর গম্ভীর মুখ, কঠোর মেজাজ এবং থমথমে চেহারা দেখার বিস্তর অভিজ্ঞতা তার আছে। সুষমার কাছে সেটা কোন নতুন অভিজ্ঞতা নয়।

তার বুক কাঁপছিল অন্য কারণে। কেননা আজকের দিনটা সম্পূর্ণ অনারকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার কেটেছে। খানিক আগেও ঝড় বয়ে গেছে এই বাড়িটাব মধ্যে। শব্দহীন ভয়ঙ্কর সেই ঝড়ের তাণ্ডব এখনও তার রক্তেব মধ্যে থমকে আছে। অমলেন্দু বাবান্দায় এসে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালো, খরদৃষ্টিতে সুষমাকে দেখে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালো। সুষমা এলো পেছন পেছন। ঘরে ঢুকেই অমলেন্দু কঠোব গলায় জিজ্ঞাসা কবল, 'খোকা এ বাড়িতে এসেছিল ?'

সুষমা জানতো, খবরটা চাপা থাকবে না। চাপা দেবাব কোন চেষ্টাও তাব মধ্যে ছিল না। সে উত্তব দিল, 'হ্যাঁ।'

অমলেন্দু জামার বোতাম খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাসকেলটা কখন এসেছিল আর কখন গেল ?'

সুষমা জানতো সব ঘটনাই তাকে সবিস্তারে বলতে হবে। মনে মনে সে তৈরি হয়েই ছিল। গলা নিচু করে উত্তব দিল, 'সন্ধ্যের মুখে মুখে। তখন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া—'

অমলেন্দু গলায় বিবক্তি ফুটিয়ে বলল, 'আঃ, তোমাব কাছে আবহাওযা সংবাদ শুনতে চাইছি না। কখন গেল ?'

সুষমা উত্তর দিল, 'তখন বাত প্রায় সাড়ে আটটা।'

গায়ের জামাটা খুলে ফেলে অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কেন এসেছিল ?'

সুষমা উত্তর দেবার আগে একটু চুপ করে থাকল। বুকেব মধ্যে নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়া বড় দ্রুত হচ্ছে। স্বামীর দুই চোখে তীব্র জিজ্ঞাসা, সেই চোখ এখন তার মুখের ওপর। সুষমা উত্তব দিল, দিতেই হল, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

অমলেন্দু অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমার সঙ্গে ! আমার সঙ্গে কিসের দরকার ?'

সুষমা জানে এবার তাকে এর পরের কথাটাও বলতে হবে। চুপ করে থাকবার কোন উপায় নেই। সুষমা বলল, 'দরকাবটা কিসের সে কথা বলেনি। শুধু বলেছে বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।'

আগুনের ছেঁকা লাগলে মানুষ যেমন ছিটকে ওঠে অমলেন্দু তেমনভাবেই ছিটকে উঠে প্রশ্ন করলেন, 'কিসের বোঝাপড়া ? যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হতে পারে না। রাসকেলটা আমার মুখে কাদা মাখিয়ে দিয়েছে। বিচার চলাকালে জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের আরও বড় সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ওকি ভেবেছে চিরকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে।

কতকগুলো গুণ্ডা আর ডাকাতের সঙ্গে মিলে জেলের মিল্ক ভ্যানে করে পালিয়ে এসেছে। এবার ধরা পড়লে ওকে কে বাঁচাবে ?'

সুষমা শান্ত গলায় বলল, 'বলেছে আবার আসবে। তোমাকে ওর দরকার।'

অমলেন্দু চুরুটের বাক্সো থেকে একটা চুরুট হাতে নিয়ে বলল, 'ওকে আমার কোন দরকার নেই। হরিকে বলে দেবে ও যেন এ বাড়িতে না ঢোকে।'

অমলেন্দু চুরুট ধরাতে ব্যস্ত হল। সুষমা স্বামীর মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, খোকা যা বলে গেল তেমন কাজ কি তার স্বামী সত্যিই করতে পারে। হয়তো জেনে-বুঝে করেনি। সুষমা সত্যিই বুঝতে পারে না স্বামী আর সন্তানের মধ্যে কে কতখানি ঠিক কথা বলছে অথবা কাজ করছে। যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কার কাছে যাচাই করবে ? স্বামী না সন্তান ?

চুরুট ধরিয়ে নিয়ে অমলেন্দু বলল, 'একে তো একটা খুনের মামলার আসামী। চেষ্টা করছিলাম যাতে খালাস করে আনতে পারি। বাহাদুরি দেখিয়ে জেল পালাতে গেল।'

নিজের মনেই গজরাতে গজরাতে অমলেন্দু হঠাৎ আঙুল তুলে স্ত্রীকে দেখিয়ে বলল, 'তোমার জন্য, এসবই তোমার জন্য। আজে-বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশতো বলে কলকাতার হোস্টেলে পাঠালাম। সেখানে গিয়ে ইউনিয়নের নেতা হয়ে বসল।'

ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে অমলেন্দু চেয়ারে বসল। পায়ের জুতো খুলে হালকা চটি পরে নিতে নিতে চুরুটে টান দিল। সুষমা আগের মতোই শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'শ্রীপল্লী থেকে একটা মেয়ে তোমার কাছে চাকরির জন্য আসতো, তোমার মনে আছে ?'

চোখ তুলে তির্যক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালো অমলেন্দু। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'দিনের মধ্যে অমন মেয়ে, ছেলে গণ্ডাখানেক করে চাকরির জন্য আসে। সবাইকে মনে রাখা কি সম্ভব।'

সুষমা মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল। খোকা বলে গেছে, মা, একটি দিনের জন্য একটু বেপরোয়া হও। বেপরোয়া না হতে পারলে তুমি বাবার মুখ থেকে সত্য জানতে পারবে না। সুষমা জানে না, বেপরোয়া কেমন করে হতে হয়। তার মধ্যে অভাব ছিল সাহসের। এখনও অভাব রয়ে গেছে। তবুও সে নিজেকে তৈরি করল। স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, 'শ্রীপল্লীর সেই মেয়েটিকে তোমার মনে রাখা অসম্ভব নয়। মেয়েটি এ বাড়িতে এসেছে কয়েকবার, তোমার মিউনিসিপ্যালিটিতেও গেছে। মেয়েটা

তোমাদের স্কুলে একটা চাকরি চেয়েছিল। তুমি দয়া দেখিয়ে তাকে কলকাতায় তোমার কোম্পানিতে চাকরি করে দিয়েছিলে।

চোখ কুঁচকে গেল অমলেন্দুর। শ্রীপল্লীর সেই মেয়েটি সম্পর্কে হঠাৎ তার স্ত্রী এত কৌতূহলী হয়ে উঠতে চাইছে কেন ? চাকরি তো হয়ে গেছে অনেক দিন। চাকরি হবার পর কালীতলায় পুজো দিয়ে মিষ্টি নিয়ে এ বাড়িতে এসে জনে জনে প্রণাম করে গেছে কতদিন আগে। আজ হঠাৎ করে সেই মেয়েটার প্রসঙ্গ তুলছে কেন সুষমা।

অমলেন্দু মনে করবার ভাব করল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। শ্রীপল্লীর সেই রিফিউজি মেয়েটা। দেখতে শুনতে বেশ ভাল, বুদ্ধিমতী। ওর বাবা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কালেকটর ছিল। এখন তো চাকরি নেই। কী যেন নাম মেয়েটার ?

অমলেন্দু বোধহয় নামটা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। সুষমা বলল, 'কবিতা। কবিতা বসু।'

অমলেন্দু এবার খুব সহজভঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করল, 'কী ব্যাপার বলতো ? ওই মেয়েটা কি এসেছিল নাকি ?'

সুষমা উত্তর দিল,'না, কবিতা আসেনি। কবিতার কথা খোকা বলে গেছে। ওর কলকাতার ঠিকানা খোকা জানে।'

অমলেন্দুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। হাতের জ্বলন্ত চুরুট নামিয়ে রেখে ফ্যাসফেসে গলায় প্রশ্ন করল, 'খোকা আর কী জানে ?'

সুষমা চলে যাচ্ছিল। অমলেন্দু তাকে ফেরাল। তার কপালে ঘাম জমে গেছে। সুষমা বুঝতে পারল কঠিন মানুষটা এখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে ভাবল, খোকা তাকে বেপরোয়া হতে বলেছে। কিন্তু স্বামীর মুখের সামনে এখন এর চাইতে আর কত বেপরোয়া সে হতে পারে। সুষমা বলল, 'আর কী জানে সেটা আমায় বলেনি। হয়তো তোমাকে বলবে।'

সুষমা চলে গেল নিচে। অমলেন্দু নিজের জায়গায় ফিরে আসতে আসতে ভাবল, খোকা কেমন করে কবিতাকে চিনবে। কলকাতার রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে খোকার যাওয়ার কথা নয়। তবে কি কবিতার বাবা অবনী খোকাকে কিছু বলেছে ? শ্রীপল্লীর ওই পরিবারটির সঙ্গে খোকার যোগাযোগের সূত্রটা রহস্যময় লাগছে তার কাছে। নির্ঘাৎ খোকা এমন কিছু বলে গেছে যাতে করে সুষমার মনে কবিতাকে নিয়ে এই কৌতূহল জন্মেছে। শুধু কি কবিতাকে নিয়ে ? নিজের স্বামী সম্পর্কেও কি তার মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ? প্রশ্ন অথবা সন্দেহ ?

অমলেন্দু বুঝতে পারল তার শরীর ঘেমে যাচ্ছে। খোকা এই বাড়িতে

এসেছিল ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে। বৃষ্টি থামার পর চলে গেছে। কোথায় গেছে সে কথা বলে যায়নি। কিন্তু এই বাড়ির বাতাসে ছড়িয়ে রেখে গেছে আগুন। অমলেন্দুর শরীর সেই আগুনে পুড়ছে। হয়তো ভয়ঙ্কর কোন অগ্নিকাণ্ডের আগে প্রকৃতিতে এমন করেই তাপ ছড়িয়ে যেতে থাকে। এই নিদারুণ উষ্ণতা অমলেন্দু সহ্য করতে পারছে না। সে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। রাসেল স্ট্রীটের কবিতার সঙ্গে খোকার যোগাযোগটা বিচিত্র এবং ভয়ঙ্কর মনে হল অমলেন্দুর। মনে মনে ভাবল, এটা কি নিতান্তই আকস্মিক যোগাযোগ নাকি এর পেছনে অন্য কারো হাত আছে। বিধানসভার জন্য সে টিকিট পেয়ে গেছে। এ সময় এরকম ঘটনা কেন ঘটল। ঘটল নাকি ঘটানো হল ? নিজের বিছানায় ছটফট করতে করতে অমলেন্দু ভাবতে লাগল, বারাসাত থেকে কলকাতায় লাইন পেতে কতক্ষণ সময় লাগবে ? হাতের সামনেই ফোন। অমলেন্দু উঠে বসে ফোনের রিসিভার তুলে নিচ্ছিল। সুষমা ঘরে এলো। অন্ধকার ঘরে তার অস্পষ্ট চেহারা দেখামাত্র অমলেন্দু চকিতে ফোনটা নামিয়ে রেখে নিজেকে যথাসম্ভব নির্বিকার এবং ব্যস্ত রাখার অছিলায় জ্বলন্ত চুরুটটা মুখে দিয়ে টানতে লাগল।

॥ ৮ ॥

ঠিক একুশ দিনের মাথায় সুখেন আবার ফিরে এলো রাসেল স্ট্রীটের সেই ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে। ওপরে ওঠার সোজা পথটা এখন সে চেনে। পেছনে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আজ আব ওপরে যাবার দরকার নেই। আজ সেদিনের মতো অন্ধকার রাত নয়। এখন শেষ বিকেলের আলো বাড়িগুলোর কার্নিশ ছুঁয়ে ঝুলে আছে। রাস্তা দিয়ে বেগে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। আজকের দিনটা সুখেনের কাছে অন্য রকম। অন্তত গত কয়েকটা দিন সে যেমন কাটিয়েছে তার সঙ্গে আজকের দিনটার পার্থক্য আছে। এই তফাৎটুকু কেবল সে বুঝতে পারে। সুখেনের মধ্যে আজ আর তেমন ভয় নেই। যে ধরনের ভয় একদা এক অন্ধকার রাতে তাকে তাড়িয়ে এনেছিল এই বাড়িটাতে আজ সে রকম কোন তাড়া নেই। রাস্তার কোন লোকজনই তাকে গ্রাহ্য করছে না। এমন কি কোন পুলিশও নয়।

এই একুশটা দিন তাকে যেন একুশ বছরের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি দিয়েছে। এমনভাবে সমৃদ্ধ করেছে যা তার কল্পনার অতীত ছিল। একুশ দিন আগে কবিতা সম্পূর্ণ অজান্তেই তার বুকের মধ্যে পুরে দিয়েছিল তপ্ত ক্ষ্যাপা হাওয়া। সেই হাওয়ার টানে ঝড়ের মতো সে ঘুরে বেড়িয়েছে নানা দিক। কিন্তু

কোথাও সে শান্তি পায়নি। বাইরের বাতাসে আর্দ্রতা পেয়েছে, নারীর গালের মতো নরম জ্যোৎস্নার আলো দেখেছে, রোদজ্বলা তপ্ত প্রান্তরে মিলেছে বটের নিটোল ছায়া। কিন্তু কোথাও মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়নি সুখেন। মুক্তি যেন এক পলাতক পাখির ছায়ার মতো। যে কেবল ডানা মেলে নাগাল এড়িয়ে উড়ে যায় দূর আকাশ দিয়ে। গভীর বিষাদ আর অচেনা এক কষ্টের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে তার মনে হয়েছে, দৃষ্টিহীনের আকাশ দেখার মতো অর্থহীন একটা বাসনা নিয়ে সবাই টিকে থাকার কদর্য পরিশ্রমে ক্লান্ত। যেন বিরামহীন বিরতিহীন একটি ফুটবল খেলা। আলাদা আলাদা পোশাকে সবাই ছুটে যেতে চাইছে গোলের দিকে। অথচ কেউই জানে না, এই বিশাল, বিস্তীর্ণ আকাশব্যাপী ক্রীড়াঙ্গণে গোলপোস্টটা কোন দিকে। দৃশ্যটা যেন মধ্যরাতের স্বপ্নের মতো একটা হেঁয়ালী, যেন অতিশয় দুর্বোধ্য কোন চিত্রকলা।

বারাসাত থেকে অটোতে সাতভাই কালীতলায় পৌঁছে সে মন্টুকে দেখতে পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু দেখবার আগে ভাবেনি মন্টুকে এমন অবস্থায় কোনদিন দেখতে হবে। দীনবন্ধুকে রাতের অন্ধকারে খুন করবার কোন পরিকল্পনা ওদের ছিল না। ওরা ভেবেছিল বজ্জাত লোকটাকে গায়ে-গতরে কিছু দাওয়াই দিলেই ভয় পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে। কিন্তু সামান্য মারেই লোকটা মরে যাবে এমন আশঙ্কা ওদের কল্পনায় ছিল না। মন্টুর চোখে-মুখে তখনও বিষম ভয় লেগেছিল। ইছামতীর দিকে অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'বিশ্বাস কর, পেটে আর বুকে কয়েকটা ঘুষি চালাতেই দীনবন্ধু হুমড়ি খেয়ে কালভার্টটার ওপর পড়ে গেল। অন্ধকারে ভাল বোঝা যায়নি। কল্যাণ লাথি চালিয়েছিল। অস্ফুটে একটা শব্দ করেই দীনবন্ধু থেমে গেল। দূরে লরির আওয়াজ পেয়ে আমরা থেমে যাই। খানিক বাদে টর্চ জ্বেলে দেখি ফিনিশ।'

মন্টুর চোখ-মুখ ফ্যাকাশে। মনে হচ্ছিল সেই রাতের দৃশ্যটা যেন এখনও সে দেখতে পাচ্ছে। ইছামতীর ওপর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস তিরতির করে বয়ে আসছিল কালীতলায়। সুখেন জানে এই জায়গাটার কর্তৃত্ব করে ন্যাপা। নেপাল নামটা ওর পোশাকী। ন্যাপা নামেই ওর পরিচয়। মন্টু ন্যাপার আশ্রয়ে এলো কেন ? যে বিশ্বাস আর বোধ থেকে দীনবন্ধুকে শিক্ষা দিতে গিয়েছিল তার সঙ্গে ন্যাপার যোগ কোথায় ?

মন্টু কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে উত্তর দিল, 'ন্যাপার এখানে পুলিশ আসেনা। শুধু প্রোটেকশনের জন্যে ন্যাপার কাছে আসতে হয়েছে।'

ন্যাপাকে সুখেন কখনও সামনাসামনি দেখেনি। সে জানে ও একটা পেশাদার গুণ্ডা। টাকার জন্য খুন, ডাকাতি, ছিনতাই কোনটা করতেই পেছপা হয় না।

অনেক ছেলে নিয়ে একটা দল চালায়। ন্যাপার নামে এই অঞ্চলটা ভেতরে ভেতরে কাঁপে। আর সুখেনের ধারণায় দীনবন্ধু জাতে খচ্চর, ধর্মে বৈষ্ণব। গলায় কণ্ঠির মালা লাগিয়ে ব্যবসাপত্তর করে। বছরে দু'বার দু' দফায় পাড়ার লোকদের ডেকে নারায়ণ সেবা করে। খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি আর শুকনো বোঁদে খাওয়ায়। মাইকে অবিরাম নাম কীর্তন চলতে থাকে আর প্যাণ্ডেলের ভেতর চলে নারাযণসেবা। বিলিফের মাল ওঠে ওরই গোডাউনে। এবার সেই মাল নাকি চুরি হয়ে গেল। সন্দেহক্রমে ধরা পড়ল যারা তাদের মধ্যে পদ্মপিসির বরও একজন।

সুখেন জানে, একদানা মালও চুরি হয়নি। শুধু দরজার তালা ভেঙ্গে মালগুলোর গোডাউন বদল হযেছে। ওর রাধাগোবিন্দের শাদা পাথরের মন্দিরের লাগোযা ঘরে আশ্রয় দিয়েছে, দূর সম্পর্কের এক বিধবা বোনকে। রাত দশটার পর দীনবন্ধু সেই ঘরে গিয়ে রাধামাধবের লীলা আলোচনা করে। সুখেন যখন ওকে ডাকতে যায়, তখন দীনবন্ধু ওই ঘর থেকেই লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে এসেছিল। এই লোকটার মৃত্যুতে সুখেনের কোন দুঃখ নেই। কিন্তু যে দীনবন্ধুকে মারতে শেখে সে ন্যাপার কাছে আশ্রয় নেয় কেমন করে ? দুটোতো একই মানুষ, শুধু কাজের ভঙ্গিতে যা তফাৎ। ন্যাপা কি যাবজ্জীবন ওকে আড়াল দিয়ে রাখবে ?

সুখেন বলল, 'ন্যাপা কোথায় ?'

মন্টু উত্তর দিল, 'আসছে। তুই একটু বোস। জেল থেকে পালিয়ে এসে তোরও তো একটা সাহারা দরকার।'

খানিকবাদেই ন্যাপা এলো। বুনো মোষের মতো চেহারা। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা। বাঁ হাতের তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে মুঠো বানিয়ে টানছে। কালো চিমনি থেকে শাদা ধোঁয়া বার হলে যেমন দেখায়, ন্যাপার বিশাল মুখ এবং নাকের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া বার হবার সময় তেমনই মনে হচ্ছিল। পুরু এবং অতীব কালো ঠোঁটের মধ্যে দারুণ রকমের শাদা দাঁতের সারি। হাসলে পবে মনে হয ভাল্লুক শাঁকআলু খাচ্ছে।

মন্টু উঠে গেল ন্যাপার কাছে। সুখেন বুঝতে পারল এখন তাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। ন্যাপা ঘাড় ঘুরিয়ে সুখেনকে বার দুই দেখল। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না সুখেনের। মন্টুর ইশারায় কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হল ন্যাপার সামনে। ন্যাপার পেছনে দু'জন চামচে গোছের ছেলে। তাদেরই একজনকে ন্যাপা হুকুম করল, 'আরে, দাদাকে সিগারেট দে।'

সঙ্গে সঙ্গে একজন ঢোলা জামার ভেতব হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল পাঁচশো পঞ্চান্ন মার্কা সিগারেটের প্যাকেট। ভেতর থেকে কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মন্টু ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিল, 'সিগারেটটা নে।'

সিগারেট মুখে নিয়ে সুখেন ন্যাপার দিকে তাকালো। এমনই একটা মুখ যাতে কোন অভিব্যক্তিই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। সুখেন সিগারেটটা মুখে নিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে লাইটারটা বার করে আনছিল। কিন্তু তার আগেই ন্যাপা নিজের ডানহাতের মুঠোয় ধরা একটা অত্যন্ত দামি লাইটার টিপে আগুন জ্বালিয়ে সেই·আগুনটা বাড়িয়ে ধরল সুখেনেব দিকে। সুখেন মাথাটা সামান্য নিচু কবে সিগারেট ধরাল। মিনিট খানেক কেউই কোন কথা বলল না। সুখেন ভাবছিল, এখানে ন্যাপার কাছে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে নিরাপত্তা যদিও বা থাকে, কোন শান্তি নির্ঘাৎ মিলবে না। কিন্তু এখান থেকে কোথায় যাওযা যায় সেই কথাটাই আবার নতুন করে তার চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বারাসাতেব বাড়িতে একবার যেতে হবে এটা সে ভেবে রেখেছিল। বাবাব সঙ্গে, অর্থাৎ মাননীয় পৌবপিতা অমলেন্দু মুখার্জির সঙ্গে তার দেখা করা দরকার। কিন্তু তাব সময় এখন নয়। যেতে যেতে দুপুব হয়ে যাবে। ভরদুপুরে তার পক্ষে বারাসাতে যাওযার কোন মানে হয় না। রাত পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তার মানে ন্যাপার এই আস্তানায় তাকে আরও কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হবে।

হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে আসাতে ন্যাপা সেটা ছুঁড়ে দিল সামনেব রাস্তার দিকে। সুখেনের দিকে তাকিয়ে অভয় দেওয়াব ভঙ্গিতে বলল, 'আমি সব জানি। আপনার ভয় নেই। এখানে সেঁটে যান। পুলিশের বাপও এখানে কোনদিন আসবে না। কিছুদিন আগে কলকাতার দেবু হালদার, নাম শুনেছেন তো, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে এখানে চলে এসেছিল। গত হপ্তায় ওকে যশোরে পাঠিয়ে দিলুম।'

ন্যাপার কথাবার্তায় বেপরোয়া ভাবটা সুখেন টের পাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, জগতের কোন কিছুকেই সে ভয় করতে শেখেনি : থানার দারোগা থেকে এস ডি ও, এস· পি এমন কি মন্ত্রীদের পর্যন্ত শালা, খচ্চর ইত্যাদি বলে সম্বোধন করছে। লোকটা যতই বেপরোয়া অথবা ক্ষমতাবান হোক না কেন, ওর পরিচয় একজন জাঁদরেল গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন লোকেব কাছ থেকে সুখেন কতটুকু সাহায্য নীতিগতভাবে নিতে পারে সেটাই ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। যদিও ন্যাপা সম্পর্কে তার অনেক কিছুই আগে থেকে জানা ছিল। ন্যাপা বিয়ে করেনি। করবার দরকারও বোধ করেনা। গণ্ডাখানেক মেয়েমানুষ সে পোষে। বছর খানেক আগে হাবড়ার এক দোকানদারকে পিটিয়ে মেরেছিল ন্যাপা। এখন

তার বৌকে মাঝে মাঝে ন্যাপা টাকা দেয়। মাসে একটা করে রাত কাটিয়ে যায় দোকানদারের বিধবা বউয়ের ঘরে। সুখেন শুনেছে ন্যাপার জন্যই পাড়ার লোকেরা ওই বিধবা মহিলাকে ভয়ে সমীহ করে চলে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ বড় ও মাঝারী ব্যবসায়ীরা হপ্তায় হপ্তায় ন্যাপার চামচাদের হাতে টাকা দিয়ে যায়। প্রতি হপ্তায় দেদার রোজগার। বর্ডার দিয়ে যারা চোরাই মাল পাচার করে তাদের কাছে ন্যাপার বাঁধা-বরাদ্দ আছে। চাইবার আগেই সাতভাই কালীতলায় টাকা পৌঁছে দিয়ে যায়। ন্যাপাকে পুলিশ ধরেছিল মাত্র দু' বার। প্রথমবার মাসখানেকের মতো লক-আপে ছিল আর দ্বিতীয়বার ঘণ্টা তিনেক ছিল থানার বড়বাবুর সামনে। তারপর থেকে ন্যাপা যে কোন মন্ত্রবলে নিজেকে পুলিশের আওতাব বাইরে এনে ফেলল সেটা সুখেনের মতো অনেকেই ভেবে পায় না। লোকটার যে এলেম আছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। মন্টু ন্যাপার সামনেই বলে উঠল, 'তোর ভয় নেই। ন্যাপার এখানে কেউ তোর গায়ে টাচ পর্যন্ত করতে পারবে না।'

ন্যাপা এমন ভঙ্গিতে সুখেনের দিকে তাকালো যেন জগৎ সংসারের আইন, প্রশাসন, সমাজ সভ্যতা এবং জনতা সবই তার হাতের মুঠোয়। আড়মোড়া ভাঙ্গার ভঙ্গি করে বলল,'দু' দশদিনের মধ্যেই সব পানসে মেরে যাবে। আমি থাকতে কোন শালা ইদিকে আসবে না।'

সুখেন ওর মুখের দিকে তাকাল। সে ন্যাপাব মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ভাবছিল, ওর কথার ওপব কতখানি ভবসা করা যায়। এমন চরিত্রের একটা মানুষেব কাছে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে কোন শান্তি নেই। তবুও অন্য কোথাও যাবাব আগে তার একটা সাময়িক আস্তানা দবকার। সুখেন মনে মনে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনি কি জানেন আমি জেল থেকে পালিয়ে এসেছি ?'

ন্যাপা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল। ওর হাসি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল, সুখেন সম্পর্কে সে সব জানে এবং এসব ব্যাপার সে তোয়াক্কা করে না। সুখেন মনে মনে আহত বিস্ময়ে ভাবল, চমৎকার সামাজিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে তার দেশে। এখানে অমলেন্দু মুখার্জির মতো বিত্তবান ক্ষমতাশালীরা থাকে সমাজের মাথায়, ন্যাপারা ঘুরে বেড়ায় নির্ভয়ে আর কবিতাদের চালান হতে হয় মালহোত্রার সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে। দীনবন্ধু সাহার মতো লোক খুন হলে পুলিশ খুনী ধববার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে, আদালতে সুখেনকে খুনী সাব্যস্ত কবা হয়।

সুখেন চুপ করে আছে দেখে ন্যাপা বলল, 'আপনার ইচ্ছে হলে এখানে থাকতে পারেন। আপনাকে প্রোটেকশন দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে চলে যেতে পারেন।'

মন্টু চোখের ইশারায় সুখেনকে রাজী হতে ইঙ্গিত করল। সুখেন সেটা গ্রাহ্য না করে বলল, 'আমাকে এখানে রাখতে গিয়ে যদি আপনার কোন অসুবিধা হয় তাহলে ?'

ন্যাপা সিগারেট ধরাচ্ছিল। লাইটার জ্বালতে গিয়ে থেমে গেল। সুখেনের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আপনাকে ধরতে তো এখানে কোন বোষ্টম আসবে না, আসতে হবে পুলিশকে। পুলিশের চোদ্দগুষ্টির কেউ এই ডেরায় পা রাখবে না। আর তেমন যদি হয় তো হোক না, ক্যালাকেলি না হলে শরীর গরম হয় না।'

মন্টু এবার এগিয়ে এসে সুখেনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। ন্যাপাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'তোর কিচ্ছু ভাবনা নেই। সব দায় ন্যাপাদার।'

সুখেন ন্যাপার দিকেই তাকিয়েছিল। ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল, 'আমার জন্যে এতখানি ঝুঁকি কেন নেবেন ?'

ন্যাপা গোল গোল চোখে সুখেনের দিকে তাকালো। তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, 'লাও ঠ্যালা ! ভদ্দরলোকের ছেলে বিপাকে পড়ে এসেছেন এট্টু আশ্রয় দেবো। কিছু না দিলে দোস্তি হবে কেমন করে।'

ন্যাপা যতখানি সরলভাবে কথাটা বলল সুখেন ঠিক ততখানি সরলভাবে কথাটা নিতে পারল না। একটা সন্দেহের কাঁটা বুকের মধ্যে বিঁধতে লাগল। সুখেন কোন কথা বলল না। ন্যাপার উল্টোদিকের বেঞ্চিটায় বসতে বসতে বলল, 'পুলিশ জানে আপনি এখানে থাকেন ?'

ন্যাপা নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'শুধু পুলিশ কেন, পুলিশের বৌ-বাচ্চারাও জানে ন্যাপা সরকার কোথায় থাকে।'

সুখেনের কৌতূহল বেড়ে গেল। সে বলল, 'তবু আপনাকে ধরে না কেন ?'

ন্যাপা সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'কিসের জন্য ধরবে ? আর যদি ধরেই তাহলে ওদের চলবে কেমন করে।'

সুখেন ন্যাপার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তার মানে ?'

ন্যাপা হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বলল, 'সব কথার মানে হয় না। এখন চেপে থাকুন। যে ক'দিন থাকতে চান থাকুন, যদি বর্ডার পেরিয়ে ভিন দেশে যেতে চান সে ব্যবস্থাও করে দেব। কিছু জানতে চাইবেন না।'

ন্যাপার কথা বলার ভঙ্গিটা শেষের দিকে ঈষৎ আদেশের মতো শোনাল। সুখেন টের পেল মন্টু তাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল। বোধহয়, সতর্ক করে দিল।

সুখেন চোখ সরিয়ে নিয়ে ইছামতীর দিকে তাকাল। শেষ দুপুরের ঘোলাটে

আলোয় নদীর দিকটা কেমন থমথমে চেহারা নিয়েছে। যদিও নদীটা এখান থেকে দেখা যায় না। কিন্তু সে জানে নদীটা কাছেই। দুটো ছেলে উত্তেজিত ভঙ্গিতে এসে ন্যাপার সামনে দাঁড়াল। ওদের চেহারার মধ্যে একটা বুনো গন্ধ। চিবুক থেকে কপাল পর্যন্ত যে মুখমণ্ডল তাতে এক কণা লাবণ্য নেই। বরং খরখরে মুখের মধ্যে একটা চাপা হিংস্রতা টের পাওয়া যায়। এরকম চেহারার ছেলেদের সে জেলে দেখেছে। জেলের অভিজ্ঞতা থেকে ধরতে পারল এদের বয়স তিরিশের নিচে। ওরা চাপা গলায় ন্যাপাকে কিছু একটা বলতেই ন্যাপা উঠে দাঁড়াল এবং বিন্দুমাত্র দেরি না করে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ন্যাপার সঙ্গে চামচে গোছের যে দুটি ছেলে ছিল তারাও ন্যাপাকে অনুসরণ করল।

জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যেতেই সুখেন মন্টুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কদ্দিন আছিস এখানে ?'

মন্টু জবাব দিল, 'তুই অ্যারেস্ট হবার পরেই আমরা পালিয়ে আসি।'

সুখেন প্রশ্ন করল, 'ন্যাপার সঙ্গে তোর আগে যোগাযোগ ছিল ?'

মন্টু উত্তর দিল, 'যোগাযোগ ছিল না, তবে ওদের দলের দু' একজনকে আমি চিনতাম। তখন, মনে কর ওই অবস্থায় চারদিকে পুলিশ খুঁজছে, সে সময় অত ভাববার অবসর কোথায়। কোন মতে পালিয়ে এসে বেঁচেছি।'

সুখেন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। জায়গাটা তার ভালো লাগছিল না ঠিকই কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সে কোথায় যেতে পারে। পুলিশের তাড়া খেয়ে যেভাবে সে কবিতাব ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিল মন্টুও বুঝি সেইভাবেই ন্যাপার আশ্রয়ে এসে পড়েছে। এক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার হয়তো কোন মানে হয় না।

মন্টু বলল, 'কী ভাবছিস ? চা খাবি ?'

সুখেন প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে দ্বিতীয়টার জবাব দিল, 'খেতে পারি।' মন্টু উঠে গেল। খানিক বাদে ফিরে এলো হাতে চায়ের গ্লাস নিয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে সুখেন বলল, 'আমাকে প্রোটেকশন দিয়ে ন্যাপার কী লাভ। আমরা তো ওর দলের নই।'

মন্টু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে উদাসীন গলায় বলল, 'হয়তো দলে ভেড়াতে চায়।'

সুখেন চমকে উঠে মন্টুর দিকে তাকালো। অস্ফুট গলায় বলল, 'তার মানে ?'

মন্টু চাপা গলায় বলল, 'আমাকে অলরেডি অফার দিয়েছে।'

সুখেন চিৎকার করে কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। মন্টুকে দেখে নিয়ে বলল, 'তুই রাজী হয়েছিস ?'

মন্টু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'এখনও হইনি। হয়তো শেষ-পর্যন্ত পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে রাজী হতে হবে। আমি তো বিজনের মতো বর্ডার ডিঙ্গিয়ে খুলনায় যেতে পারব না। সেখানে বিজনের এক মামা আছে। আমার তো ওদেশে কেউ নেই।'

সুখেন চোখের দৃষ্টি খর করে মন্টুর দিকে তাকাল। ওর মুখে দিনশেষের ঘোলাটে আলো। যেন কুয়াশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে একটা বিপন্নতা। মন্টুর চোখ দুটো ক্রমশ অসহায় হয়ে উঠছে। সুখেন ভেতরে ভেতরে মন্টুর জন্য মমতা বোধ করল।

ইছামতীর দিক থেকে চমৎকার হাওয়া আসছিল। হাওয়ার মধ্যে একটা আঁশটে গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে ক্ষীণভাবে। হয়তো কাছাকাছি কোথাও মাছ ধরা অথবা মাছের জাল শুকোতে দেওয়ার ব্যাপার আছে। সুখেন মন্টুর দিকে না তাকিয়েই বলল, 'বিজনকে বর্ডার পার করতে ন্যাপা কিছু নেয়নি?'

মন্টু ধীর গলায় বলল, 'হাজার টাকা চেয়েছিল। সাতশো টাকায় রফা হয়েছে।'

সুখেন বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল। মন্টুর সামনে পায়চারি করল। তার ভেতরে দমবন্ধ করা একটা কষ্ট। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মন্টুকে বলল, 'তুই এখান থেকে আমার সঙ্গে চল।'

মন্টু বলল, 'কোথায়?'

সুখেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তা জানি না।'

মন্টু পেছনে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বলল, 'সেটা আরও বিপজ্জনক। যে কোন সময় ধরা পড়ে যেতে পারি। ধরা পড়লেই জেল।'

সুখেন গলায় শ্লেষ ফুটিয়ে বলল, 'আর এটা? এই ন্যাপার আস্তানা, এটা কী?'

মন্টু কোন উত্তর দিল না। চারপাশে নেমে আসা অন্ধকারে ওর মুখটাকে ম্লান এবং করুণ দেখাল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুখেন দেখল মন্টুর মুখ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

চারপাশের অন্ধকার নিবিড় হবার পর ন্যাপা ফিরে এলো। ওর মুখ থমথমে। যদিও রাত বেশি নয়, কিন্তু চারপাশে গাছপালা থাকায় সন্ধ্যার চেহারাটাও গভীর এবং গম্ভীর দেখায়। ন্যাপা এসে বসল ওর ঘরে। চেয়ারে বসেই টেবিলে একটা ঘুষি মারল। অসহায় আক্রোশে মানুষ যেমন করে শূন্যে হাত-পা ছোঁড়ে ন্যাপার ভঙ্গিটা তেমনই। সে শুধু রাগের গলায় কয়েকটা অশ্লীল শব্দ উগরে দিয়ে বলল,

'শালা হারামীর বাচ্চারা।'

আরও একটু পরে ন্যাপার রাগের কারণটা সুখেন ধরতে পারল। বনগাঁ বাজার থেকে ন্যাপার দুই চ্যালাকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। তুলে নেওয়াটা কোন ব্যাপার নয়। এর মানে আজ এবং এখনই কিছু টাকা বড়বাবুর দরকার। টাকা পাঠালেই ওরা ছাড়া পাবে। হপ্তায়-হপ্তায় যা দেয় এটা তার বাইরে।

ন্যাপা পুলিশ আর বডবাবুর উদ্দেশে খিস্তি করতে করতে বলল, 'শুওরের বাচ্চারা খবর পেয়েছে কাল রাত্রে ট্রাক আটকে মোটা মাল কামিয়েছি, তাই উপরি চাইছে। একদিন শালা জিপের ওপর বড় সাইজের আলু ঝাড়বো তখন টের পাবে। বড়বাবু খচরাটাকে একদিন মার্ডার করে দেব। যদি কোনদিন ফাঁসিতে যেতে হয় তো শালা বড়বাবুকে শেষ করে তবে যাব। শালা জোঁকের বাচ্চা।'

খানিক আগেও যে লোকটার বেপারোয়া ভঙ্গি আব কথাবার্তার মধ্যে দুনিয়াকে কবজা করে ফেলার অহঙ্কার ঝলসে উঠেছিল এখন এই প্রায়ান্ধকাব ঘরে তারই মুখের অন্য চেহারা সুখেন দেখতে পেল।

সন্ধ্যে হবার খানিকবাদেই সুখেনের মধ্যে যেটুকু ভরসা দেখা দিয়েছিল সেটুকু ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে গেল। পুরোদস্তুর মাতাল হবার আগেই ন্যাপা ক্ষোভে আক্ষেপে বলতে আরম্ভ করে দিল, 'শালা রোজগারের দশ আনাই চলে যায় পুলিশকে হপ্তা দিতে। মাসে মাসে রেট বাড়াতে বলে। হপ্তায় টান পড়লেই শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তার ঢেকুর তুলে এখানে হামলা করতে আসে। আমার ছেলেদের তুলে নিয়ে যায়। আমার চাইতেও হাজার গুণ খচ্চররা ভদ্দরলোক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

সুখেন ন্যাপাকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে, 'আপনি তো এগুলো ছেড়ে দিতে পারেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ন্যাপা অসহায় গলায় বলে, 'আর পারবো না। দশটা মার্ডারের মামলা, খান চোদ্দ ডাকাতি, রেপ নানা রকম মামলা ঝুলছে। সবগুলোই সত্যি নয়। আমাকে বেঁধে রাখবার জন্যে কিছু কিছু তৈরি করা হয়েছে। ছেড়ে দেওয়া মানে হপ্তা দেওয়া বন্ধ করা। রোজগারে টান পড়লে সব কটা মামলা একসঙ্গে উঠবে। তখন ফাঁসী ছাড়া মুক্তি নেই। বাঁচবার জন্যে তাই হপ্তা দিয়ে দিয়ে এসব চালিয়ে যেতে হবে।'

সুখেন অবাক গলায় বলে, 'কতদিন?'

ন্যাপা উত্তর দেয়, 'যতদিন বাঁচবো।'

বারাসাতে ফিরে আসতে আসতে সুখেন ভেবেছিল, ন্যাপার মুখে শুধুই একটা বেপরোয়া বীরত্বের মুখোশ আঁটা। মুখোশের আড়ালে রয়ে গেছে ভীত, সন্ত্রস্ত

একটা পাংশু মুখ। ওই মুখে কোন মুক্তির চিহ্ন নেই। এমন মুখ দেখবে বলে সে গারদ থেকে পালিয়ে বাইরে আসেনি।

বাবাসাতের বাড়িতে তার জন্যে অপেক্ষা কবছিল বিস্ময় আর ভয়। কোন অভ্যর্থনা ছিল না, সেটা সে আশাও করেনি। মা আর জেঠিমা ছলছল চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তার কথা শুনেছে। কতদূর বিশ্বাস করেছে সেটা সে বুঝতে পারেনি। চলে আসবার আগে দবজায় দাঁড়িয়ে মা বলেছিল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

সুখেন একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। তবে এখানে থাকবো না এটা ঠিক করে ফেলেছি।'

জেঠিমা সুখেনের পিঠে হাত রেখে বলেছিল, 'খোকা পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা যায় না। তুই কতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবি ?'

সুখেন উত্তরে বলেছিল, 'বড়মা, পালিয়ে যেমন বাঁচা যায় না তেমনই তোমাদের মতো এই বাড়িব খাঁচাটাব মধ্যে সব মেনে নিয়েও আমি বাঁচতে পারবো না। তোমরা কেমন করে পারছো তা জানিনা।'

সুখেন চলে আসছিল। মা এসে দাঁড়াল সামনে। তার চোখের দিকে তাকানো বড় কঠিন। মায়েদের চোখগুলোয় অন্য বকম ভাষা আর আর্তি থাকে যা বুকের হিমঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। সব কিছু ধীরে ধীরে গলতে থাকে। সুখেন চোখ সবিয়ে নিয়েছিল। মা বলল, 'খোকা, তুই কি বদলাবি না ? আমাদের কথা ভাববি না ?'

সুখেন ধীর গলায় জবাব দিয়েছিল, 'আমি একা কী করে বদলাবো। বাবা-জ্যাঠাদের বদলটা আগে দরকাব। আমি অন্য রকম হতে চেয়েছিলাম বলেই তো তোমরা কষ্ট পাচ্ছো।'

সুখেন আর দাঁড়ায়নি। ঝড়ের বেগে বাইরে চলে এসেছিল। এত দ্রুত সে নেমে এসেছিল নিচে যে মা কিংবা বড়মা কেউ বুঝতেই পারেনি সুখেন এমন করে চলে যাবে। সদর দরজা ডিঙোবার আগে সে কেবল একটা ডাক শুনতে পেয়েছিল। ভীত এবং উদ্বেলিত কণ্ঠেব একটা করুণ আর্তি, 'খোকা যাসনে, খোকা—'

॥ ৯ ॥

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পর্যন্ত সুখেনের জানা ছিল না সে কোথায় যাবে। রাতের অন্ধকারে রিকশা নিয়ে সে যাচ্ছিল স্টেশনের দিকে। এখান থেকে দূরে

কোথাও যেতে হলে ট্রেনে চড়ে বসা ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। বারাসাত থেকে শিয়ালদা হয়ে তাকে অন্য কোথাও যেতে হবে। শিয়ালদা পৌঁছে সে দেখল এখন এতরাতে একমাত্র লালগোলা ছাড়া অন্য কোন দূরপাল্লার ট্রেন নেই। যেহেতু তার যাবার নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না, তার মধ্যে কেবল একটা ভাবনাই কাজ করছিল তাহল দূরে কোথাও তাকে যেতে হবে। অতএব, সে কিছু না ভেবেই লালগোলায় চেপে বসল।

ট্রেনে যেতে যেতে সে ভাবছিল, পালাবার আগে বুঝতে পারেনি পালিয়ে গিয়ে থাকবার জন্যও একটা ভদ্র আশ্রয় দরকার। জেলের হৃদয়হীন অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটা দিন থাকতে থাকতে তার মনে হয়েছিল এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে তার শান্তি নেই। বাইরে বেরিয়ে আসার আগে বাইরে বেরুতে পারাটাই ছিল তার কাছে মস্তবড় সমস্যা। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে বাইরে বেরিয়ে আসার চাইতে বাইরে থাকাটাই তার পক্ষে অধিকতর কঠিন সমস্যা। কেউ তার দিকে তাকালে সে অস্বস্তিবোধ করে। তার মনে হয় এই লোকটা কি তার কথা জানে?

এরকম জীবনও সুখেন চায়নি। তার ধ্যানের মধ্যে অন্য রকম একটা জীবন সে দেখতে পেয়েছিল। সেই জীবন তাদের বিশাল বাড়িতে নেই। সে ভেবেছিল তাদের বাড়িটাই বুঝি সৃষ্টিছাড়া। উত্তরাধিকারসূত্রে সেই জীবন সে পাবে না এটা জেনেই তার ভেতরে, একটা অভিমান জড়ানো চাপা রাগ গরগর করতো। কিন্তু ছোটকাকার মতো বাড়ি থেকে সে পালিয়ে যেতে চায়নি। তার ভেতরে একটা অহঙ্কারী স্পর্ধা ছিল। সেই স্পর্ধা থেকেই সে ভেবেছিল, সে পারবে, এই বাড়ির সমস্ত নিয়ম-কানুন সে একাই উল্টে দিতে পারবে। কিন্তু এখন এই মধ্যরাতের ঝিমধরা ট্রেনের কামরায় বসে সে ভাবল, সে ক্রমে ক্রমে একা এবং নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তার সামনে পেছনে কেউ নেই। মন্টু আশ্রয় নিয়েছে ন্যাপার কাছে। যে ন্যাপা নিজেও কোনদিন মুক্তির স্বাদ পায়নি। কল্যাণ ধরা পড়বার ভয়ে ফেরার হয়ে কোথায় গেছে মন্টুরা সে কথা জানে না। বিজন ন্যাপার সাহায্যে বর্ডার পার হয়ে খুলনায় চলে গেছে। সুখেন তো এভাবে পালাতে চায়নি। আইন মিথ্যা সাক্ষীর ওপর ভরসা করে তার ওপর অবিচার করছিল। এই কারাবাস তার প্রাপ্য ছিল না। সুখেন আইনের ছাত্র নয়, আইন সে ভালো জানে না। কিন্তু সে বুঝতে পারে না, দীনবন্ধুর মতো মানুষ খুন হলে সেই খুনের দায়ে সুখেনকে কেন জেলে যেতে হয়? মানুষের প্রিয় শরীরের একটা অংশ পচে গেলে গোটা শরীরটার জন্যই সেই অংশটাকে কেটে বাদ দিতে হয়। মানুষের বেলায় সেই কাজটা করার কি কোন আইন নেই?

সুখেনের ভাবনাটা ধাক্কা খেল। ওপরের বাঙ্ক থেকে ন্যাড়ামাথা একটা লোক নিচে নেমে এলো। ব্রহ্মচর্য নেবার সময় ছেলেদের পোশাক যেমন থাকে এই ছেলেটির পোশাকও তেমন। ছেলেটি নেমে হাওয়াই চটি পায়ে গলিয়ে ট্রেনের মধ্যে শৌচাগারে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। সুখেনের পাশে অনেকটা জায়গা খালি পড়ে ছিল; সেই জায়গায় বসতে বসতে বলল, 'কদ্দূর যাবেন?'

সুখেন বলল, 'কিছু ভাবিনি। যেখানে ইচ্ছে হবে নেমে পড়ব।'

ছেলেটি একটু অবাক হল। মনে মনে কী ভাবল কে জানে। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে চলুন আমাদের আশ্রমে। সেখানে ঠাকুরের প্রসাদ পাবেন, নামগান শুনবেন। আশা করি ভালো লাগবে। বড় শান্তির জায়গা।'

'শান্তি' কথাটার ওপর সুখেনের বড় লোভ। সে ছেলেটির সরল মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের আশ্রম কোথায়?'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'জিয়াগঞ্জে। গঙ্গার পাড়ে। আমাদের আশ্রমের নাম শান্তিভবন।'

সুখেন ট্রেনে চাপবার আগে লালগোলা পর্যন্ত টিকিট কেটে নিয়েছিল। সুতরাং জিয়াগঞ্জ নামতে তার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। সুখেন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'আমি গেলে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?'

ছেলেটি কৃতজ্ঞ হবার ভঙ্গিতে বলল, 'কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।'

জিয়াগঞ্জের শান্তিভবন দৃশ্যত সুন্দর এবং পবিত্র। যে কোন লোকেরই ভাল লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখানে, এই ধর্মীয় আশ্রয়ে সুখেন কতদিন থাকতে পারে? হয়তো কয়েকদিন পারতো। কিন্তু দুপুরের পরেই তার বুকের মধ্যে ঝড় উঠল। সুখেন খেতে বসেছিল। আশ্রমের ছেলেরা শালপাতার ওপর খাবার দিয়ে যাচ্ছে। তদারকি করছিলেন কয়েকজন সন্ন্যাসী। তাঁদের পরনে গেরুয়া। খাওয়া শেষ করে সুখেন যখন বাইরে এলো সে দেখল একজন সন্ন্যাসী, যিনি খাবার সময় বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিলেন, এখন তিনিই তার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়তেই সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, 'আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?'

সুখেন বলল, 'হ্যাঁ।'

সন্ন্যাসী এবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর বললেন, 'আপনার আদি নিবাস কি কলকাতায়?'

সঠিক উত্তর দেবার আগে সুখেন ভাবল, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই পুলিশের গুপ্তচর নয়। এমন লোককে সন্দেহ করতে তার বিবেকে বাধল। সে

বলল, 'না, ঠিক কলকাতা নয়। কলকাতাব বাইরে, মফস্বল টাউনে।'

সন্ন্যাসী এবার যেন দৈবকণ্ঠে বললেন, 'বাবাসাতে কি ?'

সুখেনের গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। সে উত্তর দেবার আগে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকালো। সন্ন্যাসীর মুখে মৃদু হাসি। হাসিটার অর্থ সে ধরতে পারল না। সে বলল. 'আপনি আমাকে চেনেন নাকি ?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'এখনও বলতে পারছি না। অনেক দিনের কথা, তাই স্মৃতিকে নির্ভর করে অনুমান করবার চেষ্টা করছি। আপনি কি অমলেন্দু মুখার্জিব ছেলে, সুখেন ?'

সুখেনের বুকের মধ্যে ঝড উঠল। উথাল-পাথাল ঝড। অনেকখানি বিস্ময আর কিছুটা আহত দৃষ্টি নিয়ে সে সন্ন্যাসীর দিকে তাকালো। তার মুখে তখনও আগের মতো মৃদু হাসি। মুণ্ডিত মস্তকে রৌদ্রের উজ্জ্বল আভা। এমন প্রশান্ত আর নির্মল চেহারার আড়ালে কি কোন পুলিশের গুপ্তচব থাকতে পাবে ? তবে কি পুলিশ তাকে ট্রেন থেকেই অনুসরণ করছিল ? সাদা পোশাকে সেই ব্রহ্মচারী ছেলেটিও কি পুলিশের লোক ? অজস্র প্রশ্ন সুখেনেব বুকেব মধ্যে এলোমেলোভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে ক্ষোভ আর অভিমান মিশিয়ে প্রশ্ন করল. 'আপনি কে ?'

সন্ন্যাসী এবার আর হাসলেন না। সুখেনের হাতটা নিজের হাতে ধরে টান দিলেন। বললেন. 'আমাব ঘরে এসো।'

॥ ১০ ॥

ওপরে যাবার জন্যে পর-পব তিনটে লিফট। সুখেনকে এখন যেতে হবে ন'তলায়। কবিতাকে অন্তত সে জানিয়ে যেতে চায়, তার আশ্রয় একদা তাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিয়েছিল কিন্তু তখনও সে জানতো না যার জন্যে সে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সেই মুক্তি সে আজও খুঁজে পাযনি। এমন কি শান্তিভবন-এর সন্ন্যাসী, হ্যাঁ, এখন আর তাকে ছোটকাকা বলার মানে হয়না. তাঁকে সন্ন্যাসী বলাই সঙ্গত। উৎপলেন্দু মুখার্জি নামটা তাঁর পরিচয় থেকে এখন খসে গেছে। ধর্মের আশ্রয় তাকে একটা শৃঙ্খলায় বাঁধা পবিত্র জীবন হয়তো দিয়েছে কিন্তু মুক্তি দেয়নি। ঈশ্বর নামক এক অলৌকিক, ব্যাখ্যাতীত স্বপ্নের মধ্যে সে বিভোর হয়ে আছে। ধর্ম তার সামনেও কোন দবজা খুলে রাখেনি। সমস্তটাই ঈশ্বরের লীলা ভেবে এক ধরনের স্বকল্পিত সান্ত্বনার মধ্যে তিনি জীবন কাটাচ্ছেন।

সুখেন বলেছিল, 'তোমার কি উচিত নয়, বাবা-জ্যাঠাদের পরিবর্তন করা। তুমি দেখতে পাচ্ছো না, সমাজে-সংসারে কী ঘটছে ? মন্দিরের মধ্যে বসে তার প্রতিকার কি সম্ভব ?'

ছোটকাকা বলেছিলেন, 'তুই তাহলে কী করতে বলিস ?'

সুখেন উত্তেজিতভাবে বলেছিল, 'ঠিক কী করলে সব শুধরে যাবে, সেটা বুঝতে পারি না। তবে মনে হয় একটা বিস্ফোরণ দরকার। সব কিছু তছনছ করে দেবার মতো কিছু করা প্রয়োজন। জীবনটা তো শুধু ভোট বক্তৃতা দলবাজি, সমাবেশে লোক জড়ো করা আর বেশি করে ক্ষমতা দখল করা নয়। মানুষের অনন্ত দুঃখ, নিরাপত্তা, মুক্তি...

উত্তেজিত সুখেনকে থামিয়ে দিয়ে ছোটকাকা বলেছিলেন, 'ওটা আমাদের পথ নয়। আমরা ঈশ্বরের সাধনা করি। আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে...'

সুখেন জানে ছোটকাকা কী বলবেন। কী বলতে চাইছেন। তাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা যত ধর্মের আখড়া বানাচ্ছো দেশে ততই পাপ বাড়ছে। একশো গজ অন্তর-অন্তর এখন শনি মন্দির আর কালীমন্দির। তুমি এটাকে ধর্ম বলবে ? চোলাই মদের ব্যবসা, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মন্দির? সাট্টা খেলা আর বেশ্যা সব কিছুই তো পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।' এর মধ্যে ধর্ম কোথায় ?'

ছোটকাকা উত্তর দিয়েছিলেন, 'এগুলো আরও বাড়বে। ইতিহাস, পুরাণ আর আজকের অর্থনীতি ভালো করে ঘেঁটে দেখ, এখন এই জিনিসই বাড়তে থাকবে।'

সুখেন রাগের গলায় বলেছিল, 'বাড়তে থাকবে আর তোমরা চুপ করে কেবল দেখে যাবে তাই তো ?'

ছোটকাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'আমাদের উপায় নেই। মহাভারতের মুষল পর্বটা পড়ে না থাকলে পড়ে দেখিস। এখন আমরা সেই সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এখন লম্পটদের হাতেই গাণ্ডীব। অর্জুনরা বীরত্বহীন। এরপরেই পরিবর্তন আসে।'

ছোটকাকার তত্ত্ব কথায় মন ভরেনি সুখেনের। তার মনে হয়েছিল, ছোটকাকার চারপাশেও ধর্মের শক্ত বেড়া। সেই বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার শক্তি অথবা সাহস তারও নেই। দাদাদের অন্যায় থেকে পালিয়ে এসে সে নিজেকে ধর্মের কাছে সমর্পণ করেছে। যেন ছোট্ট একটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে বড় একটা খাঁচায় ঢুকে পড়েছে।

সুখেনের ইচ্ছে হয়েছিল সে ছোটকাকাকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের ধর্ম কি শুধু লোকালয়ের বাইরে মঠ আর মন্দিরের মধ্যে বসে উপাসনা ? জগৎ, সংসার,

সমাজ অথবা মানুষের সঙ্গে তোমাদের কি কোন আত্মার যোগ নেই ?

ঈশ্বর তো তোমাকে ডাকেনি। তুমি তোমার সংসারে থেকে যা দেখেছো, যত কিছু শুনেছো তাতে তোমার চারপাশের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে আর সেই কষ্ট সইতে না পেরে তুমি ছুটে এসে আশ্রয় নিয়েছো ঈশ্বরের। তোমার সন্ন্যাস গ্রহণে হয়তো তোমার তৃপ্তি হয়েছে কিন্তু চারপাশের অনাচার কি থেমে গেছে ? তোমার দাদারা কি বদলে গেছে ? যে হাত দিয়ে সমাজের বড় বড় অনাচারগুলো নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে ঘটে সেই সব হাত দিয়েই তোমার মঠ-মন্দিরের উপাসনার অর্থও আসে। দীনবন্ধুও তো পরম বৈষ্ণব ছিল। গলায় কণ্ঠির মালা ঝুলিয়ে ফোঁটা-তিলক কেটে গোবিন্দ ভজনা করতে করতে রিলিফের মাল চুরি করতো। তোমরা কি বাঁচবার তাগিদে যে যার পছন্দসই একটা মুখোশে মুখ ঢাকছো ?

কিন্তু কথাগুলো বলতে পারেনি সুখেন। ছোটকাকা মানুষটা বড় ভাল। ওর নিষ্পাপ দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা গভীর আকর্ষণ আছে, ওর কথা বলার মধ্যে বেদনা মাখানো এমন একটা সরল আর্তি আছে যাকে আঘাত করতে সুখেনের খারাপ লাগে। ছোটকাকা নিজস্ব বিশ্বাসে যদি আনন্দ খুঁজে পায় তাহলে সে আনন্দ অক্ষয় হোক। দীনবন্ধু সাহা অথবা অমলেন্দুর মতো সে তো ভণ্ড এবং তস্কর নয়। সংসার তাকে কিছু দেয়নি, হয়তো তার কোন চাহিদাও ছিল না। তাই সে নিজেকে সমর্পণ করতে ছুটে এসেছে এখানে। এখানকার জীবন অন্যরকম।

সুখেন ভেবে দেখেছে, কোথাও কিছু বদলাচ্ছে না। প্রত্যেকটা মানুষ নিজের জন্য তৈরি করে রেখেছে এক একটা ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশ ঘুচে গেলেই দেখা যাবে সবাই বিপন্ন এবং ভীরু। ঠিক ন্যাপার মতো, নয়তো কবিতার মতো।

সুখেন একুশ দিন ধরে নানা জায়গায় আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে ঘুরে দেখেছে তার বাঞ্ছিত আশ্রয় কোথাও নেই। সবাই যে যার নিজস্ব খাঁচার মধ্যে নিজেদের মানিয়ে রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেখানে শরীরটার আশ্রয় মেলে, মনের মুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারো কোন স্বাধীন জগৎ আজও তৈরি হতে পারেনি। আকাশের মতো একটা দেশ সে খুঁজছিল, কিন্তু হায় !

সুখেনের বুকের মধ্যে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস শ্বাসনালী বেয়ে উঠে আসছিল।

লিফটের মধ্যে ঢুকে সুখেন বোতাম টিপল। ওপরে উঠতে উঠতে ভাবল, গোটা দেশটা বুঝি এই রকমই একটা দরজা বন্ধ করা লিফট। তার বোতামগুলো থাকে অন্য কোথাও। কোন অদৃশ্য হাত সেগুলোর ওঠা-নামা অথবা থেমে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ভেতরে থাকলে বোঝা যায় না, সে উঠছে না নামছে !

সুখেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত ভাবল, তারপর বেল টিপে সরে দাঁড়াল দরজার সামনে থেকে।

ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে কবিতা। হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি। পিঠের ওপর খোলা চুল। কবিতা অবাক হয়ে গেল। হাত তুলে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। সুখেন এগিয়ে এলো। কবিতা দরজা ছেড়ে বাইরে এসে বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এখন চলে যাও। ভেতরে এসো না।'

কবিতার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ। ফিসফিস করে কথা কইছে। সুখেন বলল, 'কেন ?'

কবিতা বলল, 'প্লিজ প্রশ্ন কোরো না। চলে যাও।'

সুখেনের আজ আর ভয় করবার কিছু নেই। সে জেদের গলায় বলল, 'আমি ভেতরে যাব।'

কবিতা মিনতি করার ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ ভেতরে যেও না, চলে যাও। আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি।'

সুখেন ক্রুর সন্দেহের চোখে কবিতার দিকে তাকাল। কবিতার চোখে নরম আর্তি।

সুখেন বলল, 'ভেতরে কী হচ্ছে ?'

কবিতা বলল, 'যাই হোক, সেটা তোমার জানার দরকার নেই।'

সুখেন বলল, 'কিন্তু দেখার দরকার আছে।'

কবিতা উদ্বেগে থরথর গলায় বলল, 'কিন্তু সহ্য করতে পারবে না।'

কবিতাকে দু' হাতে ঠেলে দিয়ে সুখেন বলল, 'আমার সহ্যের মাত্রা এত ছোট নয়। আমি পারব।'

সুখেন চলে এলো ঘরের মধ্যে। সুখেনের পেছন পেছন এসেছে কবিতা। বসবার ঘরে কেউ নেই। সুখেন দ্রুত শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই তার বুকের মধ্যে বজ্রপাত হল।

হাতে মদের গ্লাস ধরা ছিল অমলেন্দুর। সে প্রথমে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। পরক্ষণেই বলে উঠল, 'আমি জানতাম তুই একবার না একবার এখানে আসবি। আমি তোরই অপেক্ষায় আছি।'

সুখেন চোয়াল শক্ত করে জবাব দিল, 'আমিও তোমার অপেক্ষায় আছি। কিন্তু এখানে তোমাকে আশা করিনি।'

অমলেন্দু মুখার্জি উঠে দরজার কাছে এলো। সুখেন দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে কবিতা। অমলেন্দু বলল, 'আয় ভেতরে আয়। তোর বিষয়েই কথা হচ্ছিল। বল কবিতা, খোকাকে বুঝিয়ে বল।'

সুখেন ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আমাকে কারো বোঝাবার দরকার নেই।'

অমলেন্দু যে ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেছে সেটা সুখেন বুঝতে পারছিল। অমলেন্দু গ্লাসটাকে দূরে সরিয়ে রেখে বলল, 'তুই যা কাণ্ড করে বেড়াচ্ছিস তাতে তোকে বাঁচানো খুব কঠিন। শুধু একটা উপায় আছে। তুই রাজসাক্ষী হয়ে যা। দীনবন্ধুর মার্ডারারদের নামগুলো বলে দে। বাকীটা আমি দেখব।'

সুখেন পেছনের হিপ পকেটে হাত বুলিয়ে দেখল ভেতরে সেই ছুরিটা রয়েছে। হঠাৎ তার মনে হল, দীনবন্ধুকে সে তো খুন না করেই খুনীর সাজা পাচ্ছিল। এখন যদি এই ঘরে অমলেন্দুকে খুন করে তাহলে সাজাটা মেনে নিতে তার কোন কষ্ট হবে না। সে জানে, বুঝতে পারে ব্যাপারটা খুব রূঢ়, খুবই কঠিন হবে তার পক্ষে। তবুও এই কঠিন ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে সে বুঝিয়ে দিতে পারবে তার পূর্বসূরীদের কতটুকু প্রাপ্তি হওয়া উচিত তাদের বংশধরদের কাছ থেকে। আগামীকাল যে ক্ষমা করতে শেখেনি এই সত্যটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সে অনেকদিন মনে মনে ভেবেছে, ইংরেজদের কাছ থেকে হাত পেতে ক্ষমতা নেবার লোভে যারা দেশকে নির্বিচারে, দু'টুকরো করেছে সেইসব মহামান্য দেশনায়কদের যদি সে সামনে পেতো। সেদিন যা ইচ্ছে করে ভাঙ্গা হয়েছিল পরবর্তীকালে সেই ভাঙ্গনের পথ ধরেই আরও ভাঙ্গন এসেছে, হয়তো আসবে। অমলেন্দুরা মানুষের ছদ্মবেশে এক-একটি···

সুখেন চকিতে পেছনের পকেট থেকে ছোরাটা বার করে আনল। তার দুই চোখ তীব্র ক্রোধে জ্বলছে।

অমলেন্দু এতটা কল্পনাও করতে পারেনি। সে এক পা পিছিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা গলায় ডাকল, 'খোকা, খোকা তুই কী করছিস।'

সুখেন এক পা এগিয়ে এলো। অমলেন্দু দেখল তার ছেলের চোখ থেকে পুঁজের মতো গলে গলে নেমে আসছে ঘৃণার স্রোত। সেটা এত তীব্র যে অমলেন্দু সহ্য করতে পারল না। আরও দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কাতর গলায় বলল, 'খোকা, আমি, আমি তোর বাবা।'

সুখেন চাপা গলায় শ্লেষ ফুটিয়ে বলল, 'সেটাই আমার দুর্ভাগ্য।'

অমলেন্দু ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'তুই আমার একমাত্র ছেলে। আমার বহু সাধের ছেলে। তোকে আমি জন্ম দিয়েছি, পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি! আমি তোর জন্মদাতা।'

সুখেনের গলায় ঘৃণা উপচে পড়ল, 'কোন পৃথিবীর আলো? যে পৃথিবীটা তোমাদের ভোগে, সম্ভোগে আর দখলদারির লড়াইতে দেউলে হয়ে যাচ্ছে।

আমাকে জন্ম দেবার জন্য আমি তোমায় বাধ্য করিনি। তোমার ভোগ লালসার ফল আমি। সৎ ইচ্ছার নয়।'

অমলেন্দু হতাশ গলায় বলল, 'মরতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার অপরাধটা কোথায়?'

সুখেন দেখল কবিতা তার পাশে। কবিতাকে দেখিয়ে বলল, 'একটা সাক্ষী তো সামনেই রয়েছে। মেয়েটার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ওকে তুমি বেশ্যা বানিয়ে দিয়েছো। দীনবন্ধুর গোডাউনে রিলিফের মাল কোন চোর কিংবা ডাকাত নেয়নি। তালা ভাঙ্গিয়ে সেই মাল গেছে তোমাদের দখলে। আর প্রাণ জন্যে শাস্তি পেয়েছে পদ্মপিসির বরের মতো কয়েকজন গরীব লোক। রায়গঞ্জের অনাথ আশ্রমে তুমি টাকা পাঠিয়ে ভাব দাতব্য দেখাচ্ছো। ওখানে কেন টাকা পাঠাও?

অমলেন্দুর গলা ভেঙ্গে এলো। ভাঙ্গা গলায় বলল, 'কেন পাঠাই? এটা আশ্রম, সেবামূলক কাজ।'

সুখেন বলল, 'মিথ্যে বলে লাভ নেই। ছোটকাকা সেটা জানিয়ে দিয়েছে। ওখানে অনাথ আশ্রমে তোমার দয়ার দানে পালিত হয়েছে তোমারই মেয়ে। সে তার বাপকে চেনে না। সে জানে না, দারিদ্র রাঁধুনীর গর্ভে জন্মেছে বলে তার বাপ তাকে স্বীকার করেনি। শুধু লোক জানাজানির ভয়ে টাকা দিয়ে সেই হতভাগ্য বিধবাকে তুমি বাধ্য করেছো চুপ করে থাকতে। আমি সেই মেয়েটিকে দেখেছি। সে তোমার মুখের আদল পেয়েছে।'

অমলেন্দু ধপাস করে বিছানার ওপর বসে পড়ল। তার মাথা নিচের দিকে নামানো। সারা মুখ বিশ্রিভাবে ঘেমে যাচ্ছে। ঘরের ঠাণ্ডা মেশিনও তার শরীরের উত্তাপ কমাতে পারছে না।

সুখেন বলল, 'অপরাধের ফর্দটা দীর্ঘ। তুমি কেন এতদিন জেলের বাইরে আছো? কেন তোমার রক্ত শরীরে নিয়ে সুদীপাকে সেলাই মেশিন চালিয়ে পেটের অন্ন জোগাতে হয়? কেন তার নামের পাশে লেগে থাকে অনাথ?'

অমলেন্দু ভাঙ্গা গলায় বলল, 'সবই কপালের লিখন। খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।'

সুখেন ছুরির হাতলটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে বলল, 'তোমারও কপালের লিখন আর খণ্ডাবার উপায় নেই।'

সুখেন এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কবিতা ছুটে এসে অমলেন্দুকে আড়াল করে তার সামনে দাঁড়ালো। বলল, 'এসব কী হচ্ছে সুখেনদা! নিজের বাপকে খুন করতে চাইছো।'

সুখেন বলল, 'যে বাপ নিজের সন্তানকে অনাথ করতে পারে তাকে খুন করলে কোন দোষ হয়না।'

সুখেন হাতের টানে কবিতাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল। কবিতা সরল না। দুহাত দুদিকে মেলে অমলেন্দুকে আড়াল করে বলল, 'এরকম হয় না। এ তুমি করতে পারবে না।'

কবিতার কণ্ঠস্বরে কী ছিল সুখেন জানে না। তার হঠাৎ মা'কে মনে পড়ল। কানে ভেসে এল উদ্বেলিত সেই আর্তস্বর 'খোকা যাসনে, খোকা।'

জলের ঢেউ লেগে মুখের ছায়া যেমন ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, এখন কবিতার মুখটা তেমন করেই কেঁপে কেঁপে ভেঙ্গে গেল। সে স্বপ্ন দেখার মতো দেখল, কবিতা নয়, তার সামনে এখন মা দাঁড়িয়ে আছে। মা'র কপাল থেকে ছুরির ফলায় সিঁদুর মুছে দিচ্ছে সুখেন; সুখেনের আত্মা কেঁপে উঠল। চোখ বুজে মনে মনে বলল, 'মা, তুমি কেন?'

কবিতার পেছন থেকে ভগ্নকণ্ঠে ক্লান্ত অমলেন্দু বলল, 'খোকা হয়তো কিছু অন্যায় করছিস, না। কিন্তু আমিও তো অসহায়। তোর মা'র নামে যে চিটফাণ্ডের ব্যবসা সেটা আসলে মালহোত্রার। আমাকে ইলেকশনের টিকিট পাইয়ে দিয়েছেন মালহোত্রা। আমি ওর কথার অবাধ্য হতে পারি না। আমি ওর জালে বন্দী হয়ে আছি। কবিতাকে সেই কারণেই আমি সরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। আর সুদীপা! হ্যাঁ, ওটা আমার প্রথম যৌবনের ভুল।'

সুখেন বলল, 'এখনও তো সরে আসতে পারো।'

ক্লান্ত গলায় অমলেন্দু বলল, 'পারি না। সরে গেলেই বিপদে পড়ব। বিপদ এড়াতেই জড়িয়ে থাকতে হয়।'

সুখেনের মনে হল তার বাবা যেন ন্যাপার গলায় কথা বলছে। সুখেন আস্তে আস্তে ছুরিটা পকেটে রাখল। তার বুক জুড়ে অসীম শূন্যতা। সে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো।

সুখেন চলে যাচ্ছিল। কবিতা ডাকল, 'কোথায় যাচ্ছো? ছাদে?'

সুখেন এই প্রথম হাসল। বলল, 'তার আর দরকার নেই। আমি জেলেই ফিরে যাচ্ছি।'

অমলেন্দু চমকালো। কবিতা অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'কেন? সেখান থেকেই তো পালিয়েছিলে?'

সুখেন বলল, 'তখন বুঝিনি, তার থেকেও বড় একটা জেল বাইরে রয়েছে। আমারটা দেখা যায়। গারদটা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। বুঝতে পারি জেলে আছি। তোমরা সেটাও বুঝতে পারো না। এখন বড় কারাগার থেকে আমি ছোট

কারাগারে ফিরে যাচ্ছি।'

সুখেন কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে চলে এলো। পেছন থেকে সে ডাক শুনতে পেয়েছিল কিন্তু দাড়াবার প্রয়োজন মনে করেনি।

বাইরে তখন ঘোলাটে চাঁদের আলো। সুখেন পার্কটার দিকে এগোল। পার্কটা আজও অন্ধকার। তবে সেদিনের মতো গাঢ় নয়। সুখেন পার্কের পাশে এসে দূর থেকে কবিতার ফ্ল্যাটটা দেখল। পার্কের ওদিকে অন্ধকারে চাঁদের অমল আলো স্থির হয়ে আছে। দক্ষিণ থেকে উড়ে আসছে অল্প অল্প হাওয়া।

সুখেনের মনের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না একটা অচেনা কষ্টের অনুভব কেন বার বার ঢেউ তুলে তার বুকে আছড়ে পড়ছে, তাকে আচ্ছন্ন করছে। সুখেন পার্কের দিক থেকে মুখ সরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। সামনে মলিন অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে নানাবয়সী মানুষ। শহরে কোথাও কোন বড় রকমের অঘটনের সংবাদ নেই। সুখেন বড় রাস্তায় এলো। একটা পানের দোকানের সামনে কয়েকটা ছেলে গানের সঙ্গে নাচবার চেষ্টা করছে। সুখেন সিগারেট ধরাতে গিয়ে ধরাল না। তার কোন কিছুতেই কোন উৎসাহ বোধ হচ্ছিল না। বুকের মধ্যে টনটন করছে একটা কষ্ট।

সুখেন এলোমেলো ভাবে ঘুরতে লাগল। কলকাতার হোটেলগুলো এখন জমজমাট। পার্ক স্ট্রিটের মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু মেয়ে। ট্যাকসি বা ঘোড়ার গাড়ি সামনে এসে দাঁড়ালেই ওরা চটপট উঠে যাচ্ছে গাড়িতে। ফুটপাথে উলঙ্গ ছেলেকে শুইয়ে রেখে মা ছুটে ছুটে যাচ্ছে সিগন্যালে থেমে পড়া গাড়িগুলোর কাছে ভিক্ষা করতে। তারই পাশে বসে গেছে তাসের জুয়াড়ীরা। সুখেন হাঁটতে হাঁটতে ময়দানের কাছাকাছি চলে এলো। ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ির লাইন। অন্ধকার গাড়ির ভেতরে কাচের গ্লাসের শব্দ। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে মদ আর নারীর শরীরের মিলিত গন্ধ। ময়দানের অন্ধকার ভেঙে গড়িয়ে আসছে বাতাস।

সুখেন বুঝল, এখনও সময় হয়নি। নিতান্ত অসময়ে সে অস্ত্রটা বার করে ফেলেছিল। এখন শহরের বুকে মধ্যরাতের আলস্য। যে যার নিজস্ব ঘুমে অচেতন। সুখেন বাসের অপেক্ষা করতে লাগল। তার সামনে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে একটি বালক। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। সারা মুখে অনাদর, উপেক্ষা আর ক্ষুধার চিহ্ন। পরনে ছিন্ন একটা হাফপ্যান্ট। সে সুখেনের সামনে হাত পাতল। সুখেন ছেলেটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পেছনের পকেট থেকে ছুরিটা বার করে ছেলেটির হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা তোর কাছে রাখ। শুধু দেখবি যেন এর ধারটা নষ্ট না হয়। এবার

থেকে এটা তোর।'

ছেলেটি বোধহয় ভয় পেয়ে গেল কিংবা অন্য কিছু ভাবল। সে নিজের হাতের দিকে এক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে জিনিসটা দেখে নিল। তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগল বড় রাস্তার দিকে। রাস্তার দু'পাশে ঝকঝকে আলোর সারি। তার মধ্য দিয়ে সুখেন কৃষ্ণবর্ণের এক ভিখারী বালককে ছুটে যেতে দেখল। দূর থেকে দেখে মনে হল যেন এক টুকরো কালো ঝড় শহরের হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে। তার পেছনে পড়ে থাকছে আদিম অন্ধকার।

সুখেন ছেলেটিকে যতক্ষণ পারল দেখল। যখন আর দেখা গেল না তখন চোখ বুজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে সে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত বোধ করল, বোধহয় প্রচ্ছন্ন একটু আরামও।

[উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রগুলি কাল্পনিক]